182. Cc. 912. 3.

লাইব্রেরী, পুরস্কার ও প্রাইজের জন্য।

ADARSHA RAMANI.

BY

Moulvi Sheikh Abdul Jabbar.

(Author of the History of Mecca Sharif, Medina Sharif, Jerusalem and Islam Chitra etc, etc.)

আদর্শ-রমণী।

দ্বিতীয় ভাগ।

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার
প্রণীত।

ঢাকা, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে
শ্রীআশুতোষ ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৯।

All right reserved.] [মূল্য ।৵৹ আনা।

সূচীপত্র।

(দ্বিতীয় ভাগ।)

১। লতিফুন্নেসা ... ... (তোষিণী)
২। পতিব্রতা রহিমা খাতুন ... (বসারত আলী) ১
৩। ভারতেশ্বরী সুলতানা রিজিয়া... (সুপ্রভাত) ২
৪। বিদুষী গুলবদন্ বেগম ... (ভারত-মহিলা) ২
৫। সেবারতা জাহানারা বেগম ... „ ৩
৬। সাধ্বী জেবুন্নেছা বেগম .. (প্রবাসী) ৩
৭। বীরবালা চাঁদ সুলতানা ... ৪
৮। বীরাঙ্গনা খাওলা ... ... (সুপ্রভাত) ৫
৯। বীর্য্যবতী উম্মে এবান ... (সুপ্রভাত) ৬
১০। দেবী সৈয়েদা নফসিয়া .. (কোহিনুর) ৭
১১। খলিফা বেগম উম্মুল বানিন ... „
১২। দেবী ফাতেমা ... (আসমত আলী) ৮

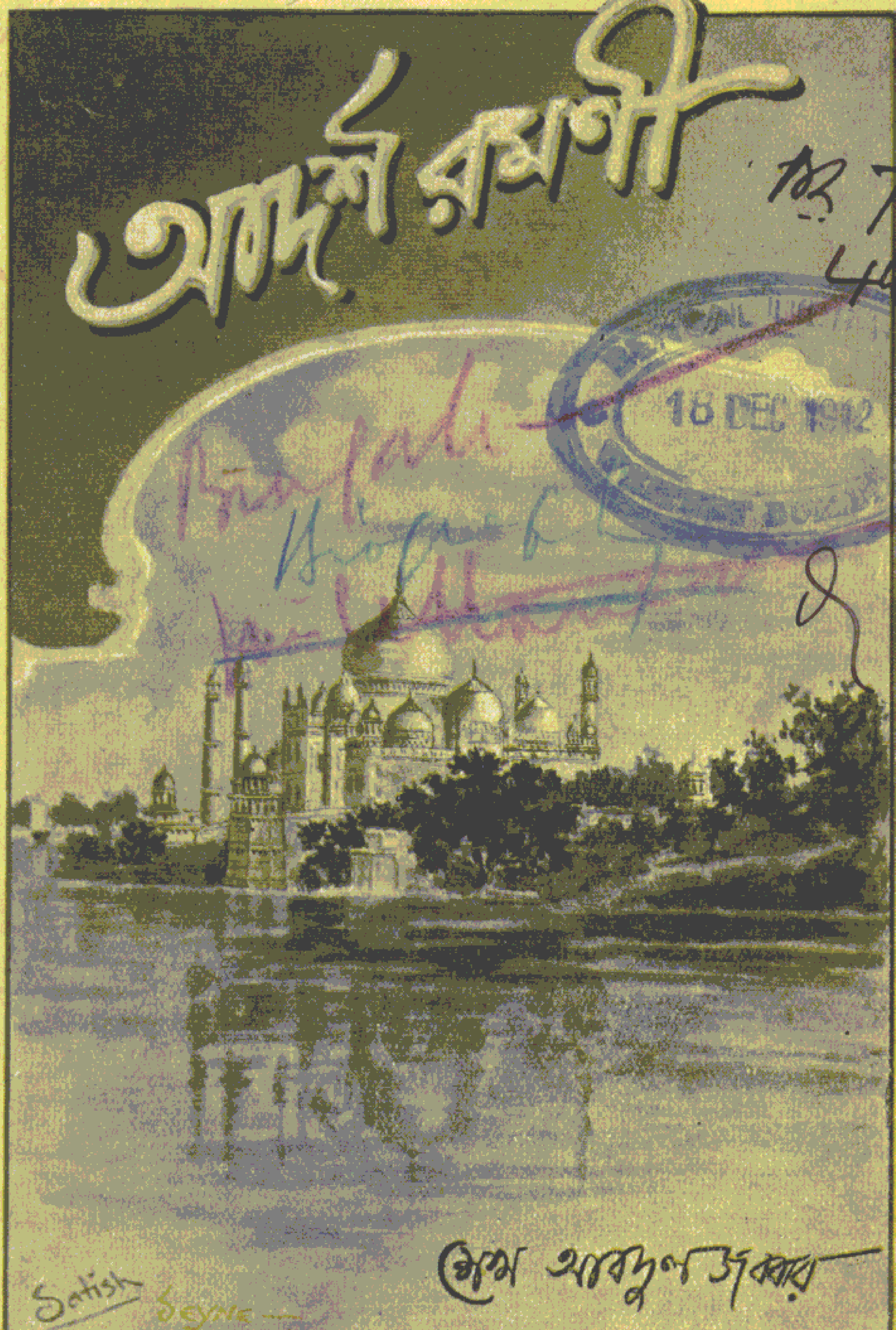

16 DEC 1912

182. Cc. 912. 3.

লাইব্রেরী, পুরস্কার ও প্রাইজের জন্ত।

ADARSHA RAMANI.

BY

Moulvi Sheikh Abdul Jabbar.

(Author of the History of Mecca Sharif, Medina Sharif, Jerusalem and Islam Chitra etc, etc.)

আদর্শ-রমণী।

দ্বিতীয় ভাগ।

মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার
প্রণীত।

ঢাকা, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে
শ্রীআশুতোষ ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৯।

All right reserved.] [মূল্য ।৶০ আনা।

IMP RI ARY
26.JUN.13

ঢাকা, আশুতোষ-প্রেসে
শ্রীরেবতীমোহন দাসদ্বারা মুদ্রিত।

উপহার-পৃষ্ঠা

আমার

....কে

সংসার কর্ম্মের প্রভাতের হাসি

দ্বিতীয় ভাগ

আদর্শ-রমণী

....

উপহার

প্রদত্ত হইল।

সন ১৯১ } ....

তারিখ............ }

হজরত মোহাম্মদের জীবনী

এমন মনোহারিনী ভাষায়, এমন অভিনব সাজে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাতার জীবনী এই নূতন। রঙ্গিন কালীতে মনোহর ছাপা, নয়ন মন-মুগ্ধকর কাপড়ে বাঁধাই। এমন উজ্জ্বল চরিত্র, এমন চিত্তাকর্ষক জীবনী জগতে দুর্লভ। ভাষা অতি সরল।

মূল্য ৷৵০ আনা।

নুরজাহান।

সুললিত মধুর ভাষায় লিখিত, দুই রঙের কালীতে বর্ডার দিয়া পুরু এণ্টিক কাগজে মোহন বেশে, মনোহর সাজে সুসজ্জিত। সিল্কের কাপড়ে সুন্দর বাঁধাই; সোণার জলে নাম লেখা।

মূল্য ৷৵০ আনা।

দেবী রাবিয়া।

দুই রঙ্গে ছাপা, সিল্কের বাঁধাই—৷৷৵০ আনা।

এমন নিষ্কাম ঈশ্বর-প্রেম, এমন করুণ প্রার্থনা, এমন কৌমার্য্যব্রতের মহিমা, এমন ভাগ্যচক্রের লীলা খেলা, এমন দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত, এমন উজ্জ্বল মনোহর চিত্তাকর্ষক ঘটনা আর কোথাও নাই।

সূচীপত্র।

(দ্বিতীয় ভাগ।)

১। লতিফুন্নেসা ... ... (তোষিণী)
২। পতিব্রতা রহিমা খাতুন ... (বসারত আলী) ১
৩। ভারতেশ্বরী সুলতানা রিজিয়া... (সুপ্রভাত) ২
৪। বিদুষী গুলবদন্ বেগম ... (ভারত-মহিলা) ২
৫। সেবারতা জাহানারা বেগম ... " ৩
৬। সাধ্বী জেবুন্নেছা বেগম .. (প্রবাসী) ৩
৭। বীরবালা চাঁদ সুলতানা ... ৪
৮। বীরাঙ্গনা খাওলা ... ... (সুপ্রভাত) ৫
৯। বীর্য্যবতী উম্মে এবান ... (সুপ্রভাত) ৬
১০। দেবী সৈয়েদা নফসিয়া .. (কোহিনূর) ৭
১১। খলিফা বেগম উম্মুল বানিন ... "
১২। দেবী ফাতেমা ... (আসমত আলী) ৮

আদর্শ-রমণী।

দ্বিতীয় ভাগ।

লতিফুন্নেছা।

(সামাজিক চিত্র।)

ঢাকা জিলায় মধুপুর একটি প্রকাণ্ড গ্রাম; প্রায় তিন হাজার লোকের বাস। বুড়ীগঙ্গা নদীর একটি বেগবতী শাখা গ্রামের ভিতরভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। বার মাসই ইহাতে জল থাকে, অতএব সারা বৎসরই নৌকা চলাচল করে। পারাপারের সুবিধার জন্য গ্রামের মধ্যস্থলে একটি "খেয়া" আছে। এই শাখা নদীর তীর-ভূমি দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের একটি পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা পাঁচ মাইল অগ্রসর হইয়া সবডিভিসনে লাগিয়াছে। আবার লোকেল-বোর্ডের আর একটি অনতি প্রশর রাস্তা গ্রামের চারি দিক ঘুরিয়া এই সড়কে সংযোগ হইয়াছে। সুতরাং গ্রামের লোকের যাতায়াতের সুবিধার চুড়ান্ত হইয়াছে; বর্ষাকালেও তাঁহাদের

জল কাদা ভাঙ্গিতে হয় না। উভয় রাস্তার দুইধারে সারি সারি জাম গাছ থাকায়, দেখিতে অতি মনোহর। আবার মাঝে মাঝে খেজুর, সুপারি, এবং নারিকেলের বাগানগুলি আরও মনোহর, আরও অপূর্ব্ব দেখায়! গ্রামের মধ্যে বড় বড় মাঠ গুলিতে রাখাল বালকেরা যখন গরু চড়িতে দিয়া গাছের নীচে বসিয়া কেহ খেলায়, কেহ গায়, কেহ ঘুমায়,—তখনকার দৃশ্য আরও বেশী মনোরম! আরও বেশী সুখকর!!

এই গ্রামে ১০।১৫ ঘর সম্ভ্রান্ত প্রাচীন মুসলমান ও হিন্দুর বাস। অপর সকলেই কৃষক, কারিগর ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী, এবং ভদ্রলোকের আবশ্যকীয় নাপিত, ধোপা, তেলি, মালী, মুচি, মুটে, মজুর, বেহারা, চাঁড়াল প্রভৃতিরও অভাব নাই। গ্রামে অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও প্রচুর, প্রায় লোকেই বাঙ্গালা জানে। এমন কি, নিরীহ কৃষকগণও কাজ কর্ম্ম বুঝিবার ও চালাইবার মত লেখা পড়া শিখিয়াছে। গ্রামের প্রত্যেক লোকই স্বস্ব ধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল; কোন ক্রিয়া কলাপই তাহাদের বাদ যায় না। প্রত্যেক মুসলমান—এমনকি ছোট ছোট বালক বালিকাগণও দৈনিক পাঁচ বার নামাজ পড়ে; প্রত্যেক হিন্দু সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। ধর্ম্মাচারে এই গ্রাম

জিলার মধ্যে প্রধান। একাধারে নানাগুণে বিভূষিত বলিয়া মধুপুর একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রাম।

এই গ্রামে কায়কোবাদ নামে এক পুরাতন বিশিষ্ট সম্মানী ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ পদে, মানে, অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর ভদ্র লোক ছিলেন। পরন্তু তাঁহার পিতা উকালতি করিয়া ঢাকায় এক প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ভগিনী, দুই ভাই। মধ্যম ভাই সবডিপুটী কালেক্টার, এবং ছোটটি সবডিবিসনাল সার্জ্জন। ভগ্নীটিকে একজন প্রতিপত্তিশালী মোক্তারের নিকট বিবাহ দিয়াছেন। কায়কোবাদ সাহেব পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া অধিক স্নেহ বশতঃ লেখা পড়ায় অধিকদূর অগ্রসর হন নাই; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় খুব দক্ষ্যতা আছে, আর সঙ্গীত বাদ্যেও তিনি বিশেষ পারদর্শী। সর্ব্বদা তিনি নানাপ্রকার পুস্তক পড়িয়া অধিক সময় কাটাইয়াছেন।

কায়কোবাদ সাহেবের দুই ভ্রাতা উপযুক্ত হইলেও তাঁহার অবস্থা খুব সচ্ছল নয়। তাঁহার পিতা সদরের একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া প্রথম বয়সে অবস্থা বিস্তর উন্নত করিয়া তুলিলেও, আফিং সেবনের বদ্ অভ্যাস করিয়া

তিনি ধ্বংসের মুখে পতিত হন। ক্রমশঃ তিনি এই কদর্য্য নিশার এমনই বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, কাচারী গমন পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি কেবল আফিং সেবনে বিভোর থাকিতেন। এইরূপে তাঁহার সঞ্চিত ধনও নিঃশেষিত হইতে থাকে। শেষে তিনি বহু টাকা ধার রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।

কায়কোবাদ সাহেব সম্ভ্রান্ত এবং সুখী ঘরের সন্তান বলিয়া পড়া শুনায় উদাসীন হইয়া গান বাজায় মত্ত ছিলেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সেতার বাজাইতে অসীম পটু। তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটিলে তিনি বিপন্ন হইয়া, দুইটি ভাইকে উপযুক্ত শিক্ষিত করিয়া দিবার অঙ্গীকারে ভগ্নীকে তাঁহাদেরকুল হইতে কিঞ্চিৎ নীচ ঘরে বিবাহ দিতে বাধ্য হন। তাঁহার ভগ্নীপতি মোক্তার সাহেবও সত্য পরায়ণ ধার্ম্মিক লোক; তিনি প্রতিজ্ঞা-মত ছোট জনকে এণ্ট্রান্স এবং বড় জনকে বি, এ, পাশ করা পর্য্যন্ত খরচ বহন করিয়াছেন। অতঃপর কায়কোবাদ সাহেব ঢাকার ত্রিতল বাড়ী বিক্রয়ে ঋণ পরিশোধ করিয়া আগ্রা, দিল্লী, প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান গুলিতে পরিভ্রমণ করত বাড়ী প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি কাব্য-সাগর মন্থন করিতেছেন।

এখন তিনি পৈতৃক জমিদারীর সামান্য আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ভাই দুইটি চাকরী লইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। ছোটজন ডাক্তারী করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন বটে, কিন্তু তৎসমস্ত স্বীয় বিলাসিতায়ই খরচ করিয়া ফেলিতেছেন ; বড় ভাইকে সাহায্য করা, বা বাড়ী, সম্পত্তি করিবার দিকে তাঁহার একবারেই মনোযোগ নাই। সবডিপুটী সাহেব ত এখন নিজের লইয়াই ব্যস্ত।

কায়কোবাদ সাহেবের বই ও পত্রিকা পাঠে বড়ই আগ্রহ, এবং তিনি খুবই উৎসাহী লোক। ৫।৭ খানি মাসিক পত্রিকা এবং ৪।৫ খানি সাপ্তাহিক কাগজ সর্ব্বদাই তাঁহার টেবিল শোভা করিয়া থাকে। এইজন্য গ্রামের বহুলোক সর্ব্বক্ষণ তাঁহার বৈঠকখানায় কাগজ পড়িতে আসিয়া থাকেন। সমাগত লোক তাঁহার হাসিমাখা মুখের আদর অভ্যর্থনায় এবং খোশ গল্পে ও পান তামাকে পরম পরিতোষ হইয়া বাড়ী গমন করেন।

কায়কোবাদ সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে, পূর্ব্বদিকে পুষ্করিণী, পুষ্করিণীর দক্ষিণ পারে জুমার মস্‌জেদ। ইহা তাঁহার পৈতৃক কীর্ত্তি। মস্‌জেদে আজান দিতে ও নামাজ পড়াইতে একজন মৌলভী রাখিয়াছেন। মৌলভী সাহেব বেশ

উপযুক্ত লোক। তিনি প্রথমে মধ্যবাঙ্গালা পাশ করিয়া তৎপর মাদ্রাসা পাশ করিয়াছেন। মাদ্রাসায় তিনি ইংরেজীও শিখিয়াছেন।

কায়কোবাদ সাহেবের যত্নে তাঁহার বাটীতে একটি মিডেল মাদ্রাসা-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সাত বৎসর যাবৎ ইহা সুচারু-রূপে চলিতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত মৌলভী সাহেব এই মিডেল মাদ্রাসা-স্কুলের হেড্ মৌলভী; এবং তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়া, মাইনার পাশ গ্রামের এক ব্যক্তি সেকেণ্ড মৌলভী। হেড্ মাষ্টার হেড্ পণ্ডিত, সেকেণ্ড মাষ্টার সেকেণ্ড পণ্ডিত সকলেই গ্রামস্থ মুসলমান। ছাত্র সংখ্যা দুই শত। ছাত্র—হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয়; মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাই অধিক। পুকুরের পূর্ব্বপারে টিনের প্রকাণ্ড ঘরে স্কুল। মস্‌জেদের সন্নিকটে স্কুল থাকায়, মুসলমান ছাত্রেরা সকলেই মস্‌জেদে একত্র মিলিয়া উপাসনা করিতে পারে। মৌলভী সাহেবদ্বয় যত্ন করিয়া প্রত্যেক ছাত্রকেই নামাজ শিক্ষা দিয়াছেন।

এই গ্রামে দুইটি মাইনার স্কুল, একটি মিডেল মাদ্রাসা স্কুল, এবং দুইটি বালিকা বিদ্যালয়। বালিকা বিদ্যালয় একটি বিপিন বাবুর বাড়ীতে, অপরটি কায়কোবাদ সাহেবের বাড়ীতে।

এই স্কুলটি আন্দর-মহলের প্রায় সংলগ্ন। শিক্ষক দুইজন ;—একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত, আর একজন বৃদ্ধ মৌলভী। স্কুলটি মুসলমান পাড়ায় বলিয়া, সত্তরটি ছাত্রীই মুসলমান। স্কুলে মধ্যবাঙ্গালা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং কোরান-শরীফ ও উর্দ্দু কেতাবাদি পড়ান হয়।

কায়কোবাদ সাহেবের তিন পুত্র তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠ ছেলে ঢাকায় তাঁহার মাতামহের নিকট থাকিয়া ইংরেজী পড়িতেছেন ; মধ্যমটি মিডেল মাদ্‌রাসা-স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে এবং ছোটটি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেছেন। কন্যা দুইটির মধ্যে জ্যেষ্ঠাটি নিম্ন-প্রাইমারী হইতে বৃত্তি রাখিয়া মধ্যবাঙ্গলা পাশ করিয়া সুপাত্রে বিবাহিতা হইয়াছেন। মধ্যমা লতিফুন্নেছা প্রথম শ্রেণী, এবং কনিষ্ঠা হায়াতুন্নেছা নিম্নপ্রাইমারী পড়িতেছেন। লতিফুন্নেছাও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় নিম্নপ্রাইমারী হইতে বৃত্তি রাখিয়া প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন।

লতিফুনের বয়স তের বৎসর। কায়কোবাদ সাহেব এবং তাঁহার বিবী উভয়েই লতিফুনের প্রাইবেট শিক্ষক। বিবী সাহেবাও মধ্যবাঙ্গলা উত্তীর্ণা ; সুতরাং কন্যাকে সযত্নে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

লতিফুন প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করত "অজু"

করিয়া ফজরের নামাজ সম্পন্ন করেন। কোন দিন লতিফুন মাতার সঙ্গে, আবার কোন দিন বা একাকিনীই আপন কামড়ায় নামাজ পড়েন। বর্ত্তমান বৎসর প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছেন বলিয়া সর্ব্বদা নিয়মিত কোরান-শরীফ পাঠ করিতে অবসর প্রাপ্ত হননা। কিন্তু পূর্ব্বে কদাপি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইত না। যাহা হউক, নামাজ সমাপান্তে লতিফুন অধ্যয়নে বসেন। নয়টা পর্য্যন্ত পাঠে নিরত থাকেন।

কায়কোবাদ সাহেবের দুইটি বাঁদী ও দুইটি গোলাম আছে। তাহারা প্রত্যেকেই নামাজ পড়ে। বাঁদী দুইটি প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই নামাজ পড়িয়া বৃহৎ আঙ্গিনা এবং ঘর কয়টি ও দালান দুইটি ঝাড়ু দিয়া তৎপর ডেগ ডেগচি প্রভৃতি মাজিয়া ফেলে। তারপর পুকুর হইতে কলসীগুলি জলপূর্ণ করিয়া পাকশালা সারি সারি সাজাইয়া, প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক কামরায় এক একটি কলসী রাখিয়া আসে। অতঃপর মাছ, মাংস, তরকারী কাটা কুটা করিয়া মসলা পিষিয়া লয়।

লতিফুন নয়টা বাজিলেই রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া প্রজ্জ্বলিত উনানে পাক চড়াইয়া দেন, এবং দশটার মধ্যেই পাক শেষ করিয়া ফেলেন।

লতিফুন সম্ভ্রান্ত লোকের সুখী কন্যা হইলেও, এবং গৃহকার্য্যের জন্য দুইটি উপযুক্তা দাসী থাকিলেও, তিনি নিজ হাতে রন্ধন করেন। লতিফুন তাঁহার গুণবতী মাতার নিকট এই সুন্দর, সুসঙ্গত অভ্যাসটি শিখিয়াছেন। পাক কার্য্যে লতিফুন অসাধারণ অভ্যস্ত। সর্ব্ববিধ পাকই তিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। লতিফুনের পিতা মাতা, ভাই ভগ্নী, চাকর চাকরাণী—সবই তাঁহার হাতের পাক খাইতে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

রন্ধন হইয়া গেলে, লতিফুনের মা নিজে দেখিয়া সকলকে আহার করান। এদিকে মৌলভী সাহেব, লতিফুনের দুইটি ভাই স্নানান্তে আহার করিয়া স্কুলে চলিয়া যান। লতিফুনও পাক শেষ করিয়াই ছোট ভগ্নীটিকে লইয়া আন্দর পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া দুইবোনে আহারে বসেন। এগারটার পূর্ব্বেই তাঁহারা স্কুলে উপস্থিত হন।

নামাজ পড়িবার জন্য একটা বাজিতেই বালিকা বিদ্যালয় ও মিডেল মাদ্‌রাসা-স্কুল ছুটী হয়; বালকেরা মস্‌জেদে নামাজ পড়ে, এবং বালিকারা লতিফুনের সঙ্গে তাঁহার পরিষ্কার কামরায় নামাজ সমাপন করে; দেড়টার সময় ঘণ্টা বাজিলেই স্কুলে চলিয়া যায়।

চারিটার সময় ছুটী হইলে লতিফুন মৌলভী সাহেবকে এবং পিতা ও ভাই দুইটিকে ফির্নী, জর্দ্দা, ক্ষীর, মোহনভোগ প্রভৃতি যখন যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাই তাঁহাদিগকে জল খাবার দিয়া, নিজেও মাতা, ভগিনী ও চাকরাণীদিগকে লইয়া জলযোগ করেন। এই জল খাবার চাকরাণীরা প্রস্তুত করে, এবং লতিফুনের মাতা এক খানি চৌকিতে বসিয়া দেখাইয়া দেন। কিন্তু স্কুল বন্ধের প্রত্যেক শুক্রবার লতিফুন জল খাবার নিজ হাতে প্রস্তুত করেন।

অতঃপর আসরের নামাজ পড়িয়া লতিফুন উইল ও সেলাই-য়ের কাজ করিতে বসেন। গ্রীষ্মের সময় আন্দর মহলের পুকু-রের বাঁধা ঘাটে, বকুল গাছের নিম্নে বসিয়া এই সব কাজ করেন। নানা রঙ্গের উইল দিয়া লতিফুন সুন্দর সুন্দর টুপী তৈয়ার করেন; আর পিতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই অতি আগ্রহের সহিত লতিফুনের সেই টুপী লইয়া আপন আপন শিরোশোভা বর্দ্ধন পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করেন। লতিফুন আপন হাতে জামা সেলাই করিয়া পিতা ও ভ্রাতাদিগকে পরিধান করান। উইলের ফুল, লতা অঙ্কিত ফ্রেম গুলিতে লতিফুনের পরিষ্কার কামরা কতই না মনোহর দেখায়! তাঁহার কামরার পরিপাটী দেখিলে প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একটি চাকরাণী আবার বাড়ী ঘর ঝেটাইয়া তৈজসপত্র মাজিয়া ফেলে, অপর চাকরাণীটি পাকশালা পরিচ্ছন্ন করিয়া কলসী গুলিতে জল ভরিয়া রাখিয়া দিয়া মাগরেবের নামাজ পড়ে। লতিফুনও নামাজ পড়িয়া পাঠে মনোনিবেশ করেন। ওদিকে এক চাকরাণী উনান ধরাইয়া ভাত চড়াইয়া মসলা পিষ্রিতে বসে ; অপর জন ব্যঞ্জন তরকারীর বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্তা হয়। সব প্রস্তুত হইলে, লতিফুন পাকগৃহে প্রবেশ করিয়া রন্ধন করেন। রাঁধা হইয়া গেলে, তাঁহার মাতা গিয়া বহির্ব্বাটীতে ভাত পাঠাইয়া দেন ; তথায় কায়কোবাদ সাহেব আপন পুত্রাদিসহ মৌলভী সাহেবকে লইয়া আহারে বসেন। অতিথি অভ্যাগত থাকিলে, তাঁহারাও একত্র বসিয়া ভোজন করেন। কায়কোবাদ সাহেব বড়ই অতিথি ভক্ত। দুইবেলা অতিথ অনুসন্ধান করিতে মসজেদে ২।৩ বার লোক পাঠান, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। ইঁহাদের আহার সমাপ্ত হইলে, চাকর ও গোলামদের জন্য ভাত পাঠাইয়া বিবী সাহেবা লতিফুন, হায়াতুন ও চাকরাণীদিগকে লইয়া ভোজন করেন।

লতিফুন এশার নামাজ পড়িয়া আবার পড়িতে বসেন। এই সময় কায়কোবাদ সাহেব আসিয়া লতিফুনকে পড়া বুঝাইয়া ও

অঙ্ক কষিয়া দিয়া যান। বিবী সাহেবা সকল সময়েই লতিফুনের পার্শ্বে থাকিয়া সাহায্য করেন। বারটা পর্য্যন্ত লতিফুন পড়া শুনা করিয়া, তার পর নিদ্রা যান।

এই গেল লতিফুনের নিয়মিত দৈনিক কাজ। লতিফুন পিতা মাতা ও গুরুজনকে অতিশয় ভক্তি করেন; এবং কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নীদিগের সকল আব্দার সহ্য করিয়া প্রাণের সহিত স্নেহ করেন। স্কুলের বালিকাদিগকে আপন ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসেন। সকলের সহিত প্রসন্নচিত্তে হাস্যমুখে কথা বলেন। বালিকা যেন সরলতার অপূর্ব্ব অপ্সরী!

লতিফুন সর্ব্বগুণের আধার। এই আদর্শ বালিকা যাঁহার গৃহ আলোকিত করিবে, তাঁহার গৃহ উজ্জ্বল হইবে, চিত্তবৃত্তি অসাধারণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে, এবং তাঁহার জনক জননী, ভাই ভগ্নীও অপূর্ব্ব সুখী হইবে। হায়! এমন লক্ষ্মীরূপিণী কন্যা ছাড়িয়া কায়কোবাদ সাহেব কিরূপে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবেন!

সম্ভ্রান্ত মধ্যবৃত্ত লোক যদি স্বস্ব বালিকাদিগকে কায়কোবাদ সাহেবের প্রাণ লইয়া লতিফুন্নেছার মত গড়িয়া তুলেন, শিক্ষিত করেন, তবে পতিত মুসলমান সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইবে। অহো! আমরা কবে সেই পুণ্যযুগ দেখিতে পাইব!

পতিব্রতা রহিমা খাতুন।

মহাত্মাদিগের আবির্ভাবে জাতীয় ইতিহাস গৌরবান্বিত হয়। তাঁহাদের অনুকরণে ও পদানুসরণে জাতীয় মহত্ব ও অতিলৌকিক ভাবের বিকাশ হয়। ভারতীয় নারী স্বেচ্ছায় পতিচিতায় দগ্ধ হইয়া পতিভক্তির উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়াছেন; সীতা, সাবিত্রীর ন্যায় সতী সে আদর্শে রং ফলাইয়া উহাকে আরও মনোরম করিয়াছেন। যে সকল পাঠক সেই সমুদায় নিখুঁত চিত্র পাঠ করিয়াছেন, দেবী রহিমা খাতুনের কাহিনী তাঁহাদের চোখেও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া অনুমিত হইবে।

তুরস্কের অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশে মহাপুরুষ আইউব নবী জন্ম গ্রহণ করেন। অপরিমিত ধন-রত্ন ও অশেষ সদ্‌গুণ প্রযুক্ত সেকালে তিনি একজন সম্মানিত ও কৃতী পুরুষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। লিখিত আছে, তাঁহার ধন-রত্নের পরিমাণ এত ছিল যে, তাহার হিসাব করা যাইত না এবং উষ্ট্র, হস্তী, অশ্ব, গবাদি গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও চল্লিশ সহস্রের অধিক ছিল; আর ঐ সকলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংখ্যাতীত চাকর নফর নিয়ত তাঁহার দ্বারে বিদ্যমান থাকিত। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু,

বান্ধব ও প্রতিবেশী মণ্ডলীর হাস্য কোলাহলে তাঁহার ভবন আনন্দ মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। নবীবর যেমন অশেষ সম্পদ ও যশ লাভ করিয়া ইহলৌকিক কৃতার্থতা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি আবার নানারূপ পুণ্য অনুষ্ঠান দ্বারা পারলৌকিক কল্যাণসাধনেও সতত যত্নপর ছিলেন। তিনি নিয়ত দশজন ক্ষুধার্থকে অন্ন জল না দিয়া কখনও পানাহার করিতেন না এবং দশজন বস্ত্র-হীনকে বস্ত্র না দিয়া নিজে উত্তম বসন পরিধান করিতেন না। আতিথ্যপ্রিয়তার জন্য আইউব নবীর যশোগীতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার দানশীলতায় প্রতিদিন অসংখ্য অতিথি প্রচুর পরিমাণে পানাহার করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইত। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জনে উপাসনা করিতেন, এবং স্থিরচিত্তে ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। শত শত পাঠক ও উপাসক, তাঁহার অন্নবস্ত্রে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহার ভবন সর্ব্বদা মুখরিত করিয়া রাখিত। গৃহপালিত পশুর আনন্দ ধ্বনিতে, কবি ও পাঠকের গীতি কবিতায়, বন্ধু বান্ধব সেবক ও উপাসকের হাস্য কোলাহলে তাঁহার ভবন এক সুখ-নিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হইত। মহাপুরুষ আইউব নবী ক্রমে চারিজন ললনার পাণি গ্রহণ করেন। বিবী রহিমা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা।

ন্যায়, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় আইউব নবীর চরিত্র উন্নত ও গৌরবান্বিত ছিল। বিপদই মানুষের পরীক্ষাস্থল। মহাপুরুষ আইউব এইরূপ বিপদাগ্নিতে পতিত হইয়া স্থিরচিত্তে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন যে তিনি "সহিষ্ণু" এই অতি বড় সম্মান-জনক উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন।

বিধির অলক্ষ্য ইঙ্গিতে আইউবের পূর্ণ ধন-ভাণ্ডার ক্রমে শূন্য হইয়া আসিল। সাধক, উপাসক, বন্ধু বান্ধবের ক্রমে তিরোভাব হইতে লাগিল। স্বীয় প্রাপ্যের অসদ্ভাব হওয়ায় চারক, দাস, দাসী একে একে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। প্রভুর শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া শিষ্যগণ স্থানান্তরিত হইল। আহারের অভাবে সকল পশু দুর্ব্বল হইয়া পড়িল এবং একে একে বিনষ্ট হইতে লাগিল। হাস্য কোলাহলে মুখরিত আনন্দ ভবন নিরানন্দ শ্মশানের ন্যায় হইয়া উঠিল। নবীবরের পুত্র কন্যাগণ সকলেই বিদ্যা শিক্ষা করিত। একদা মন্দিরের ছাদ ভগ্ন হওয়ায় সকলেই এক সঙ্গে প্রাণ হারাইল। দগ্ধচিত্ত আইউব চারিজন সহধর্ম্মিণীসহ ভবিষ্যদ্ বিপদ আলিঙ্গন করিবার জন্যই যেন সেই শ্মশানের পাহারা কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন।

অভাবনীয় দারিদ্রতা, প্রাণাধিক পুত্র কন্যাগণের আকস্মিক

মৃত্যু ভবিষ্যদ্ বিপদের সূচনা মাত্র। বিবী রহিমা এই বিপদে মুহ্যমান হইলেও অত্যাশ্চর্য্য ভাবে আত্মদমন করিয়া শোকদগ্ধ স্বামীর শোকাপনোদনে সচেষ্ট রহিলেন।

যত ঝঞ্ঝা বাতাস এতদিন হৃদয়েই বহিয়া ছিল, ক্রমে শরীরের উপর উহার প্রভাব আরম্ভ হইল। নবীবর পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে এক প্রকার ভয়ানক স্ফোটক উদ্ভূত হইল; এবং অল্পদিন মধ্যেই পাকিয়া যাওয়ায় উহা হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ পূয নির্গত হইতে লাগিল। তিনি স্ফোটক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। স্বেচ্ছায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তিও তাঁহার রহিল না। এদিকে স্ফোটকের গন্ধও ক্রমে গৃহসীমা অতিক্রম করিয়া পল্লীময় ব্যাপ্ত হইল। যে সকল সহৃদয় প্রতিবেশী প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন তাঁহারাও ক্রমে তাহা বন্ধ করিলেন। এমন কি তাঁহার অন্য তিন স্ত্রীও তাঁহার নিকট আসিতে ঘৃণা বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময় বিবী রহিমা আত্মবিস্মৃতা হইয়া প্রাণপণে পীড়িত স্বামীর শুশ্রূষায় রত রহিলেন।

তিনি এই অসহ্য দুর্গন্ধ অকাতরে সহ্য করিয়া স্ফোটক সকল প্রতিদিন আটবার করিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। পূয, দূষিত বমন স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া তাঁহাকে অন্য বস্ত্র পরিধান

করাইতেন; আইউব যখন স্ফোটক-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেন,তখন স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে ব্যজন করিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন ; পথ্য প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে আহার করাইতেন। অন্য কোন প্রকার অভাব বা বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় ভীষণ রাত্রিতেও বিবী রহিমা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন। ফলতঃ মানব-কলেবরে যাহা যাহা সম্ভব, রহিমা তৎসমুদয় সম্পন্ন করিতে অনুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন নাই, চারি বৎসর কাল অনন্যমনে স্বামী সেবা করিলেন।

ক্রমে নবীর উৎকট ব্যাধি আরও ভীষণাকার ধারণ করিল। স্ফোটক সকল বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং শরীরময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হইয়া গেল। হস্তপদাদির মাংস সকল পঁচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। এই সময় তাঁহার অন্য তিন স্ত্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব পিতৃভবনে চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া আইউব রহিমাকেও কহিলেন—"প্রিয়তমে! বিধাতা এঅদৃষ্টে আর কত ক্লেশভোগ লিখিয়াছেন বলিতে পারি না। তুমি এ যাবৎ কাল অকাতরে যত ক্লেশ ভোগ সহ্য করিয়াছ, নারীকুলে এত ক্লেশ কেহই সহ্য করিতে পারে না। আমি পীড়ার যন্ত্রণায় যৎপরো নাস্তি কষ্ট পাইতেছি বটে, কিন্তু তোমার অনাহার ও অনিদ্রা-

জনিত কষ্টে ততোধিক দুঃখানুভব করিতেছি। আমার ইচ্ছা, তুমি কিছু দিন পিতৃ-ভবনে অবস্থান করিয়া আত্মক্লেশ অপনোদন কর।" পতিপ্রাণা রহিমা মৃতকল্প স্বামীর মুখে এই প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অতঃপর বাষ্পাকুললোচনে প্রেমগদ্গদ্স্বরে বলিলেন, "স্বামিন্! প্রাণেশ্বর! চিরসেবিকা দাসীকে আজ এতাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য কেন বলিতেছেন, বুঝিতে না পারিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইতেছি। যদি অজ্ঞাতসারে সেবা-শুশ্রূষায় কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে সেবিকাজ্ঞানে এ দাসী কি ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে না? দাসীর পক্ষে পিতৃ-ভবন নরকতুল্য। দাসীকে নরক-কুণ্ডে বিসর্জ্জিত হইতে কেন আদেশ করিতেছেন?" এই বলিয়া সতী রহিমা স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন, এবং বলিলেন, "হৃদয়েশ্বর, শৈশবে পিতার মুখে শুনিয়াছি, পতির চরণতলই নারীর স্বর্গ; পতিসেবাই সতীজীবনের নিত্য ব্রত ও প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে পতিই সতীর অবলম্বন। অতএব নাথ, পিতৃভবনে গমনের কথা তুলিয়া চির কিঙ্করীকে আর মর্ম্মাহতা করিবেন না, যত দিন এ দেহে প্রাণ থাকিবে, নাথের চরণ-সেবা করিয়া যাইতে পারিলেই দাসী আপনাকে পরম কৃতার্থ

জ্ঞান করিবে। প্রাণেশ্বর! যদি চরণ-সেবায় এ নশ্বর দেহ বিনষ্ট হয়, তবে এ সংসারে দাসীর পক্ষে তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। নাথকে এ অকথ্য দুরবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে পিতৃ-গৃহে সুখভোগ করিব? দাসীর পক্ষে সে সুখ ভয়ানক নরক-যন্ত্রণা হইতেও ভয়াবহ।" নবীবর আইউব পতিমাত্রসার সাধ্বী রহিমার এই প্রকার অমৃতময় বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আর দ্বিরুক্তি বা আপত্তি করিলেন না, ভগবানের নামামৃত পান করিয়া অসহনীয় অবস্থায়ও স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

কালক্রমে আইউব নবীর গলিত মাংসে এক প্রকার বিষকৃমির উদ্ভব হইল। অপরিসীম সহিষ্ণুতা গুণে তিনি এযাবৎ ভয়ানক রোগ-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে বিষ-কৃমির ভয়ানক দংশনে একবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। অসহ-নীয় যন্ত্রণায় তিনি ভয়ঙ্কর চীৎকার আরম্ভ করিলেন। এই সময় প্রতিবেশিগণ তাঁহার গলিত দেহের দুর্গন্ধে ও গগনভেদী চীৎকারে রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ করিল। পতিপ্রাণা রহিমা প্রতিবেশি-গণের এই নিদারুণ মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া স্বামীশোকে অধীর

হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা সতী নারী জনে জনের পায়ে ধরিয়া কত অনুনয় বিনয় করিলেন, তথাপি কেহ তাঁহার প্রাণের ব্যথা বুঝিল না, সতীর কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না। এক প্রকার বাঁশদোলায় আরোহণ করাইয়া লোকে তাঁহাকে অন্য গ্রামে ফেলিয়া আসিল। আদর্শ সতী রহিমাখাতুন লোকলজ্জা তুচ্ছ করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিলেন। সেখানের লোকেরাও তাঁহার গলিত দেহের অসহনীয় গন্ধে ও ভয়ঙ্কর চীৎকারে অস্থির হইয়া তাঁহাকে গ্রামান্তরে পরিত্যাগ করিল। কথিত আছে, মহাপুরুষ আইউব এইরূপে ক্রমে সাতটি গ্রামে পরিত্যক্ত হইলেন। পতিভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সতীরূপিণী রহিমাও মর্ম্মস্পর্শী চীৎকারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অশেষ-সুখ-সম্পদের অধিকারী নবীবর আইউব শেষে গ্রামের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক এক জনশূন্য প্রান্তরের তরুতলে বিসর্জ্জিত হইলেন। সুখদুঃখের সমাংশভাগিনী রহিমাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভীষণ প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইলেন।

অলৌকিক পতিভক্তির ন্যায় অসাধারণ মিতব্যয়িতাও রহিমার চরিত্র অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। পতি তাঁহাকে সম্পদকালে যাহা যাহা দিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের স্ত্রী

লোকগণের ন্যায় তিনি তৎসমুদয় ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বহু দিবসাবধি স্বামীর উৎকট পীড়া-নিবন্ধন লোকালয়ে থাকিতেই তৎসমুদয় নিঃশেষিত হইয়াছিল। অসহায় অবস্থায় রিক্ত হস্ত হইয়া তিনি দশদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত পথ্যাদির কোনই সংস্থান করিতে না পারিয়া ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর জন্য আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। অবগুণ্ঠনবতী রহিমা স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থে তৃতীয় দিবস ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিলেন। তিনি চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম ঘুরিয়া প্রতিদিন যাহা পাইতেন, তাহাতে কোন প্রকারে স্বামীর সংস্থান হইত।

একদা রহিমা সমস্ত দিন লোকালয়ে ঘুরিয়া কিছুই পাইলেন না, সন্ধ্যার অব্যবহিত প্রাক্কালে এক গৃহস্থবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। গৃহকর্ত্তা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তদীয় স্ত্রী গৃহপ্রাঙ্গনে বসিয়া স্বীয় অদীর্ঘ কেশদাম বিন্যাস করিতেছিল। রহিমা তাহাকে বলিলেন—“মা, আমার স্বামী বহুদিন যাবৎ ভয়ানক রোগে কাতর। আমার ভিক্ষার উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিতেছে। আজ সারাদিন ঘুরিয়া আমি কিছুই পাই নাই। যদি আপনি দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা প্রদান করেন, তবে

তদ্দারা তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে।” অতিলম্বিত কেশদামে রহিমার মস্তক ভূষিত ছিল। দুষ্টবুদ্ধি গৃহস্থ-রমণী তজ্জন্য প্রলুব্ধ হইয়া বলিল—“যদি তোমার কুন্তলরাজী আমায় কর্ত্তন করিয়া দিতে পার, তবে তোমাকে এক সপ্তাহের উপযোগী ভিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি।” রহিমা বিনয়সহকারে কহিলেন, “মাতা, ইহা আমার স্বামীর সম্পত্তি, ইহাতে আমার কোনই অধিকার নাই। বিশেষতঃ তিনি উত্থান-শক্তি-রহিত, এই কেশগুচ্ছ অবলম্বন করিয়া দৈনন্দিন উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আপনাকে ইহা কর্ত্তন করিয়া দিলে তাঁহার উপাসনার ব্যাঘাত হইবে। অতএব মাতঃ, আপনি এই অকিঞ্চিৎকর কেশগুচ্ছের আশা পরিত্যাগ করুন।” পাষাণময়ী রমণীর মন কিছুতেই বিগলিত হইল না। অতি কর্কশস্বরে সে কহিল,—“আমি তোমার ও সব বাজে কথা শুনিতে চাহি না, যদি তুমি আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর, তবে আমিও তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিব।” নিদারুণ অপমান ও ঘৃণায় রহিমার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গেল; মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বামীর অসহনীয় যন্ত্রণা ও উপবাস-ক্লেশ স্মরণ করিয়া আত্মক্ষোভ বিস্মৃত হইলেন। এক মুষ্টি ভিক্ষার জন্য পাষাণী রমণীর অন্যায় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। রমণী নিজ

হস্তে বিবী রহিমা খাতুনের ভ্রমরকৃষ্ণ কুন্তলরাজি কাটিয়া লইল, এবং শঠতা পূর্ব্বক তাঁহাকে এক সপ্তাহের ভিক্ষার পরিবর্ত্তে মাত্র এক দিনের ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিল।

এক দিনের ভিক্ষা লইয়া মুণ্ডিতকেশ রহিমা খাতুন স্বামী সকাশে উপস্থিত হইয়া, অন্ন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন।

রহিমা এইরূপ অসহনীয় অপমান ও নিদারুণ ক্লেশ পরম্পরা অম্লানচিত্তে সহ্য করিয়া অষ্টাদশবর্ষ কাল অনন্যমনে স্বামী-সেবা করিয়াছিলেন, এক দিনের জন্যও তাহাতে রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন নাই, এবং নিজের সুখসম্পদের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই।

অষ্টাদশ বর্ষ পরে দয়াময়ের অসীম অনুগ্রহে নবীবরের পীড়ার উপশম আরম্ভ হইল। মেঘমুক্ত শশীর ন্যায় তিনি দিন দিন নবশ্রী ধারণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিষকৃমির দংশন নিবারণ হইল, এবং ক্ষত স্থান সকল নবমাংসে পূর্ণ হইতে লাগিল। ফলতঃ বসন্তাগমে তরু যেমন নব-পল্লব-পুষ্পে বিভূষিত হয়, তিনিও সেইরূপ দিন দিন হারাণো শরীর পুনঃ লাভ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রহিমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। নবীবর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলে তাঁহাকে লইয়া সতী পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ভারতেশ্বরী সুলতানা রিজিয়া।

ঐশ্বর্য্যশালিনী, সৌভাগ্যশালিনী এবং সৌন্দর্য্য ও গুণে বিশ্ববিমোহিনী **সুলতানা রিজিয়া** যেমন বিশাল ভারতের অধীশ্বরী ছিলেন, তেমনি রমণীকুলের কিরীটিনী ছিলেন। দিল্লীর **সম্রাট্ সুলতান আলতামাস** সুলতানা রিজিয়ার পিতা। তিনি বিচক্ষণ কর্ম্মপটু সুচতুর নরপতি ছিলেন। সুলতান আল তামাস দাসরাজা, এবং দাসরাজাদিগের মধ্যে তিনিই নানাবিধ গুণে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। আলতামাস পঁচিশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাল্যকালে তিনি দাসরাজ কুতুবুদ্দিনের দাস ছিলেন, এবং অবশেষে সৌভাগ্যের সীমায় পদার্পণ করিয়া কুতুবুদ্দিনের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কুতুবের মৃত্যু ঘটিলে আলতামাস **দিল্লীর সিংহাসন** অধিকার করিয়া বসেন। এই সময় **বখ্তিয়ার খিলিজী** বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতে ছিলেন।

স্থলতান আলতামাস স্বর্গারোহণ করিলে, তদীয় পুত্র রুকুনুদ্দিন সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শাসনকার্য্যে অপটু প্রতিপন্ন হইলে, ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে তদীয় কনিষ্ঠা ভগ্নী রিজিয়াকে সিংহাসন প্রদান করা হয়। রুকুনুদ্দিন মাত্র সাত মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজরাজেশ্বরী রিজিয়া ভিন্ন আর কখনও কোন রমণী দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা রিজিয়ার জীবনীর ইহাই বিশেষত্ব! ইহাই গৌরব!!

ঐতিহাসিকগণ এইরূপে স্থলতানা রিজিয়ার গুণকীর্ত্তন করিয়া ইতিহাসের কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছেন।—

—"তাঁহার (স্থলতানা রিজিয়ার) পিতা আলতামাস যখন দূরদেশে যুদ্ধযাত্রা করিতেন, তখন তিনি কন্যা রিজিয়ার হাতে দিল্লীর ভার অর্পণ করিয়া যাইতেন। আলতামাস বলিতেন যে, —"রিজিয়া পুরুষের প্রাণ ও বুদ্ধি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং কন্যা রিজিয়া কুড়িটি পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর।"

—"তিনি রাণী হইয়া প্রায় তিন বৎসর কাল, দৃঢ়হস্তে ও স্থশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাদিগের ন্যায় অবগুণ্ঠন করিতেন না।

পুরুষের পরিচ্ছেদে দিল্লীস্থিত আফ্‌গান সুলতানদিগের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রতিদিন প্রকাশ্য দরবারে কার্য্য কর্ম্ম দেখিতেন, এবং সাক্ষাৎকার কামনায় যে কোন পুরুষ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইত, তাহার সহিতই দেখা সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করিতেন।”

মহারাণী রিজিয়া জনৈক আবিসিনীয় ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করিলে, রাজদরবারের সমস্ত সম্ভ্রান্ত আফ্‌গান ক্রুদ্ধ হইয়া রিজিয়ার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে যত্নতৎপর হন। এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া তিনি স্বীয় মস্তকে বিপদ আহ্বান করেন, এবং স্ব সম্প্রদায়ের বিষনয়নে পতিত হন। ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহীদল প্রবল হইয়া উঠিলে, তিনি আত্মরক্ষার্থে তুর্কজাতীয় এক সর্দ্দারের ধর্ম্মপত্নী হইতে বাধ্য হন। বিদ্রোহীগণ যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিলে, তুর্কী সর্দ্দার অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়াও ভাগ্যলিপি খণ্ডন করিতে পারেন নাই; যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে স্বামী স্ত্রী উভয়েই তাঁহারা নিহত হন। এইরূপে ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধীশ্বরী সুলতানা রিজিয়া শোচনীয়ভাবে অকালে স্বর্গারোহণ করেন।

বিদুষী গুলবদন বেগম।

মুসলমানদিগের সুখ-সৌভাগ্য, যশ-কীর্ত্তি, সম্ভ্রম-গৌরব, আচার-ব্যবহার, তাঁহাদের ধর্ম্মভাষায় ও জাতীয় ভাষায় নিবদ্ধ থাকায়, আরবী পারসী অনভিজ্ঞ অপর জাতির নিকট তাহা অর্গল বদ্ধ। যত দিন সেই সমস্ত. বিবরণপূর্ণ ইতিহাস বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত না হইবে, তত দিন তাঁহাদের জাতীয় কলঙ্ক বিমোচন হইবে না।

অনেকেই অনুমান করেন যে, মুসলমানেরা বিদ্যা শিক্ষায় উদাসান ছিলেন। এ কথা সর্ব্বৈব অমূলক। মুসলমানেরা যখনই যে দেশের উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছিলেন, তখনই তাঁহারা সেই দেশে আপন আপন জাতীয় ভাষারও উৎকর্ষ বিধান করিতে ছিলেন। পৃথিবীর বহু স্থানের বহু ভাষায় বহু জ্ঞানরত্ন কুড়াইয়া লইয়া তাঁহারা জাতীয় ভাষায় সঞ্চয় করিয়া পুঞ্জীকৃত করিয়াছিলেন।

অতঃপর ভারতবর্ষে যে সকল মুসলমান নরপতি আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও পারস্য ভাষায় যথেষ্ট উন্নতি বিধান

করিয়াছিলেন। দিল্লীর প্রাতঃস্মরণীয় সম্রাট্ শাহ্‌জাঁহানের পুত্র **কুমার দারা শেকু** কর্ত্তৃক **মহাভারতের** পার্শী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি (১৯১১) ডাক্তার ডেলিসন রস সাহেব পাঞ্জাব ও লাহোর হইতে দুই খানি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দুই খানিও দারা শেকু রচিত পারসী পুস্তক। একখানি **উপনিষদ** বিশেষের অনুবাদ। প্রায় দুই শত বৎসরের কথা—ইংরেজের সময় হইতে পার্শী হীনপ্রভ হইয়া পরিম্লান হইয়াছে।

পূর্ব্বে শুধু মুসলমান পুরুষগণই যে বিদ্যা শিক্ষা করিতেন, এমন নহে, তাঁহাদের অন্তঃপুরের মহিলাগণও শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। প্রত্যেক রমণীই অন্ততঃ পক্ষে সুচারুরূপে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। ইহা তাঁহাদের জন্য কঠোর কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। অনেক রাজকুমারীই বিদুষী বলিয়া ইতিহাসে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে **দিল্লীশ্বর বাবর শাহের** দুহিতা, মহামতি **সম্রাট্ আকবরের** পিতৃষ্বসা **গুলবদন বেগম** একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ। গুলবদন বেগম **হুমায়ুননামা** নামে তদীয় ভ্রাতা হুমায়ুনের এক উৎকৃষ্ট জীবনী রচনা

করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়, এবং ইহার ভাষা-সৌন্দর্য্য নিরতিশয় মনোহর।

এই হুমায়ুননামা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ রেভারিজের পত্নী ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া মূল-পার্সীসহ লণ্ডন নগরে প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতার ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে (রাজকীয় পুস্তকালয়ে) উহার একখানি সংরক্ষিত আছে।

যে বিদুষীর গ্রন্থ সুদূর ইউরোপেও উচ্চ সমাদরের সহিত আদৃত ও অনূদিত হইয়া প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহার আর বিদ্যাবত্তার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সেবারতা জাহানারা বেগম।

জগতে যাঁহারা অতুল বিভবসম্পন্ন মানবশ্রেষ্ঠকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবতুর্ল্লভ অতুলনীয় সুখৈশ্বর্য্যে লালিতা পালিতা হন, তাঁহারা স্বভাবতই বিলাসমোহ, আত্মপরায়ণ, শ্রমবিমুখ, আলস্যাতুর, কর্ত্তব্যহীন ও শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন। সর্ব্বদা দাসীরাশিতে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান না করিলে, শয়ন বা বিশ্রাম কালে তুগ্ধফেণনিভ কুসুম সদৃশ কোমল কমনীয় শয্যায় আরাম না করিলে, তুর্মূল্য রত্নাভরণে সুসজ্জিতা না হইলে, হুকুমের অপেক্ষায় শত শত জন ব্যস্তভাবে দণ্ডায়মান না থাকিলে, বার মাস সমভাবে অনন্য সাধারণ চব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় পানাহার না করিলে, বড়ই লজ্জার কথা; তবে আর তিনি মহাসৌভাগ্যশালী নরসিংহের তুহিতা নন, বনিতা নন। জগতের এই মোহবন্ধন মহামন্ত্রে সকলেই দীক্ষিতা, সকলেই গৌরবান্বিতা। কিন্তু অপরিসীম ধন ঐশ্বর্য্য, অতুলনীয় সুখস্বচ্ছন্দতা, অভাবনীয় মানসম্ভ্রম, অসংখ্য রত্নালঙ্কার, অনুপমেয় রাজপ্রাসাদ, অগণিত আজ্ঞাবহ দাসী, বহুমূল্য আভরণ, অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্ক, আতর বিচ্ছুরিত কুসুম-শয্যা, গোলাপের স্নানাগার—পৃথিবীর মানব কেন,

স্বর্গের অপ্সরীগণেরও স্পৃহনীয়। এই সমস্ত তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া **জাহানারা বেগম** স্ব ইচ্ছায় কারাগারে প্রবেশ করিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ পাদশাহ্ ত বহু উচ্চের কথা, সামান্য রাজা জমীদারের গৃহেও যাহা অসম্ভব, বিশাল ভারতেশ্বর সম্রাট্ শাহ্ জাহানের বিদুষী কন্যা, শাহ্ জাদী জাহানারা তাহাই করিয়া মরজগতে এক মহান্ অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যাঁহার সম্মুখে শত শত দাসী সেবা করিতে করযোরে উপস্থিত থাকিত, যাঁহার জীবনে মুহূর্ত্তকালের জন্যও পরের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া অভিজ্ঞতা জন্মে নাই; তিনি কারাগারের কষ্ট উপেক্ষা করিয়া পিতৃসেবায় নিরত হইয়া কি অলৌকিক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রমণীকুলের বরেণ্য হন নাই?

সম্রাট্ শাহ্ জাহান স্নেহবাৎসল্যতায় বিভূষিত ছিলেন। তদীয় মহিষী রাজরাজেশ্বরী **মোমতাজমহল** অকালে কালকবলিত হইলে, সম্রাট্ তাঁহার কয়টি শিশু কুমারও কুমারীকে লালন পালন করিয়াছিলেন। বেগম মোমতাজ মহলের ভালবাসায় তাঁহার নিকট সম্রাট্ শাহ্ জাহান আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। সুতরাং শাহ্জাদা শাহ্জাদীদিগকে তিনি মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং অপত্য-স্নেহে লেখা পড়াও শিক্ষা দিয়াছিলেন।

পাদশাহ্ শাহ্জাহান জাহানারাকে শুধু বিদ্যা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাঁহার রাজনীতি শিক্ষারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাহানারা রাজনীতিতেও পারদর্শিনী হইয়া উঠেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জাহানারা বেগম রাজকার্য্যে সর্ব্বদাই পিতার সাহায্য করিতেন। তিনি যেমন বিদুষী ছিলেন, তেমনই রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। সম্রাট্ শাহ্জাহান এই বুদ্ধিমতী কন্যার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজ করিতেন না। বাস্তবিক জাহানারা দয়াধর্ম্ম-পরিপূর্ণ রাজনীতি-বিশারদ উচ্চহৃদয় মহিলা ছিলেন।

বেগম জাহানারার পিতৃভক্তি জগতে অতুলনীয়। তাদৃশ সৌভাগ্যশীলা, সুখ-ঐশ্বর্য্যে লালিতা পালিতা রাজবংশীয় শাহ্‌জাদীর স্বেচ্ছায় কারাগারের ক্লেশ আহ্বান করা, এবং পিতার দুঃখে সমদুঃখিনী হওয়া, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সমাজে নিতান্তই দুর্ল্লভ, এমন ভক্তিশীলা রমণী নারীকুলের গৌরববর্দ্ধিনী। রাজনীতি ও পিতৃভক্তিতে জাহানারার গৌরব স্বর্ণে সোহাগার ন্যায় কোমল ও উজ্জ্বল করিয়াছে।

সম্রাট্ শাহ্জাহান সাত বৎসর কাল অবরুদ্ধ থাকিয়া জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া ছিলেন। এই দীর্ঘ সময় জাহানারা

তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া সকল কষ্ট দূরীভূত করিতেন, এবং কায়মনপ্রাণে সেবা শুশ্রূষা করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিতেন। বড়ই কষ্টের সময়, বড়ই দুর্দ্দশার সময় কারারুদ্ধ শাহ্জাহানকে জাহানারা মাতৃস্নেহে যত্ন করিতেন; তাঁহার দুঃখক্লিষ্ট বেদনা-ব্যঞ্জক প্রাণে জাহানারা স্নেহসিক্ত ধাত্রীর ন্যায় ভক্তিপ্লুত-প্রীতি-প্রফুল্লহৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেন। জাহানারা সম্রাট্ শাহ্জাহানের অন্ধের যষ্টি ছিলেন, আঁধারের আলো ছিলেন, এবং মরু-হৃদয়ের অমৃত-প্রস্রবণ-স্বরূপিণী ছিলেন। এহেন পিতৃগতপ্রাণা কন্যার যত্নেই তিনি দীর্ঘ কাল কারা-ক্লেশ সহ্য করিয়াও জীবিত ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ এই পূতশীলা বেগমের গৌরব-কাহিনী বর্ণনা করিয়া স্বীয় স্বীয় ইতিহাসের কলেবর সুসজ্জিত ও গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছেন।

"শাহ্জাহানের বন্দিদশায় তদীয় প্রিয়তমা কন্যা জাহানারাই তাঁহার জীবনের আলোক-স্বরূপিণী ছিলেন। ভক্তিমতী কন্যার প্রীতিপূর্ণ সেবা শুশ্রূষাই তাঁহার সান্ত্বনার হেতু হইয়াছিল। বের্ণিয়ার জাহানারাকে অনিন্দ্য সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও পিতৃস্নেহপরায়ণা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। শাহ্জাহান তাঁহাকে আদর করিয়া পাদ্‌শাহ বেগম উপাধি প্রদান

করেন। কি গৃহস্থলীর তত্ত্বাবধান, কি রাজনৈতিক মন্ত্রণা, সকল বিষয়েই শাহ্‌জাহান তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। জাহানারাও একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। আওরঙ্গজেবের চক্রান্তে শাহ্‌জাহান কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে,তিনিও স্বেচ্ছায় কারাবাসিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিস্নিগ্ধ সেবা-শুশ্রূষায় শাহ্‌জাহানের কারাক্লেশ যে বহুপরিমাণে উপশমিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।*

"জাহানারা পিতার মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। জাহানারার শেষ জীবন সম্ভবতঃ দিল্লীতে অতিবাহিত হইয়াছিল। পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লী আসিতে পথে একটি প্রকাণ্ড সমাধি-স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। * * তাহারই পার্শ্বে মরি! মরি! কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! * * তাঁহার (জাহানারার) একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবর, মধ্য স্থান শ্যামল দুর্ব্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষদেশে একটি শ্বেত মর্ম্মর-ফলকে তাঁহার নিজের রচিত একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে ঃ—

---

* মোগল বংশ।

বহু মূল্য আভরণে করিওনা সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণশ্রেষ্ঠ আবরণ দীনা আত্মা জাহানারা
সম্রাট্ কন্যার।” *

---

* নবীন চন্দ্র সেন।

সাধ্বী জেবুন্নেছা বেগম।

রমণীকুল-গৌরব, সাধ্বীগণের আদর্শ, কৌমার্য্যব্রতের শিরোমণি প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী জেবুন্নেছা হিজরী ১০৫৭ অব্দে জন্মলাভ করেন। তিনি শাহানশাহ্ আওরঙ্গজেব আলমগীর পাদশাহের পঞ্চম দুহিতা ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম নওয়াব বাঈ বেগম।

শৈশবেই জেবুন্নেছার মেধাশক্তি ও সরল স্বভাব বিকশিত হওয়ায় রাজমহল আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। জেবুন্নেছার আধ আধ ভাষার ভাঙ্গা ভাঙ্গা মিষ্ট কথায় বিশাল ভারতের রাজকর্ম্ম-ক্লিষ্ট সম্রাট্ আওরঙ্গজেব ক্লান্তি দূর করিতেন। এই মধুর ভাষার জন্য রাজান্তঃপুরের সকলেই জেবুন্নেছাকে অধিক স্নেহ করিতেন।

জেবুন্নেছার পাঁচ বৎসর বয়সের সময় সম্রাট্ ইস্‌লামের প্রথামত জনৈক উচ্চ শিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া কোরাণ-শরীফ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। জেবুন্নেছা স্বাভাবিক উচ্চ প্রতিভা সহই জন্ম লইয়া ছিলেন। কিছু দিন কোরান-শরীফ পাঠ করিলে তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা

কোরান কণ্ঠস্থ করিবার জন্য বেগবতী হয়। শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে, সাত বৎসরের বালিকা অসাধারণ অধ্যবসায় অবলম্বনে দুই বৎসর মধ্যে কোরান-শরীফ মুখস্থ করিয়া ফেলেন। সম্রাট্ ইহাতে এতই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, এক প্রকাণ্ড জলসা করিয়া সমস্ত আমীর উমরা ও সিপাইদিগকে বহু খেলাত "বখ্‌শিস" করিয়া ছিলেন।

জেবুন্নেছার কণ্ঠস্বর এমনই মধুর ছিল যে, যিনি তাহা এক বার শুনিতে পাইতেন, তাঁহার কর্ণ কেবলি উৎসুক হইয়া সেই মিষ্ট স্বর শুনিতে ব্যাকুল হইত। একদা জেবুন্নেছা প্রাতরুপাসনা সমাপনান্তে প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানের 'সেহনে' বসিয়া বিভোর-প্রাণে কোরান-শরীফ পাঠ করিতে ছিলেন,—তখন চারি দিকে ধীরে ধীরে প্রভাত-বায়ু বহিতে ছিল, পূর্ব্ব গগনে সূর্য্য উদিত হইয়া সোণার আভা ছড়াইয়া দিতে ছিল, শীতল বাতাস মৃদু মন্দ গতিতে বাগানে প্রবেশ করিয়া গাছ নাড়িয়া নাড়িয়া ফুল নাচাইতে ছিল, বুল বুল প্রভৃতি কানন-প্রিয় পাখী উষার নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিতে ছিল, এমন সোণার স্নিগ্ধ প্রভাতে জেবুন্নেছার অমৃতবর্ষিণী কোকিল-কূজন সদৃশ কোরান পাঠের স্বর-মাধুরী উঠিয়া পড়িয়া উদ্যানকে স্বর্গীয় নন্দন-কানন করিয়া তুলিয়া

ছিল। এমন মধুর রমণীয় প্রভাত কালে সম্রাট্ আলমগীরও নামাজ শেষে বাগানে ভ্রমণ করিতে আসিয়া জেবুন্নেছার সুললিত কোরান পাঠ হর্ষাপ্লুত প্রাণে অনন্যমনে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। জেবুন্নেছা কোরান-শরীফের যে অংশ আবৃত্তি করিতে ছিলেন, উহার অর্থ অতি মহৎ ও হৃদয়োন্মাদকর ছিল, পাদশাহ্ কোরানের অর্থসৌন্দর্য্যে ও পাঠমিষ্টতায় আত্মহারা হইলেন। এইরূপে জেবুন্নেচ্ছা দৈনিক নির্দ্দিষ্ট পাঠ অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পড়িয়া নীরব হইলেন। ধর্ম্মপিপাসু পাদশাহ্ উন্মাদ প্রায় ছুটিয়া গিয়া জেবুন্নেছাকে কোলে লইয়া তাঁহার কপোল দেশে অপরিমিত আহ্লাদে চুম্বন করিতে করিতে দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া তাঁহার কল্যাণ কামনা করিলেন।

অতঃপর সম্রাট্ জেবুন্নেছাকে আরবী শিক্ষা দিতে লাগিলেন। চারি বৎসর মধ্যে আরবী সাহিত্যেও তিনি সম্পূর্ণ দক্ষতা লাভ করিলেন। এই সময় জেবুন্নেছা পারসী ভাষাও অধ্যয়ন করেন। সময় সময় জেবুন্নেছাকে সম্রাট্ কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেন, আর জেবুন্নেছা অবলীলাক্রমে তাহার সুন্দর সুন্দর উত্তর প্রদান করিতেন। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া তখন তদীয় শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

তৎপর সম্রাট্ দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াইতে ইচ্ছা করিলে, জেবুন্নেছা স্বীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী ব্যতীত অন্য কোন বিষয় পাঠ করিতে অমত প্রকাশ করেন ; তখন হইতে কেবল তিনি কোরান শরীফ, হাদিস শরীফ ও ফেকা গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করেন। জেবুন্নেছা কোরান-শরীফের শুধু নীরস পাঠিকা ছিলেন না, তিনি এক জন কোরানমর্ম্মজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। কোরান-শরীফ ও হাদিস প্রভৃতির পাঠ শেষ করিয়া তিনি উহা বস্তা বাঁধিয়া রাখিয়া দেন নাই, সর্ব্বদাই এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, এবং অজিফার (ঈশ-স্তোত্র পাঠ) জন্য বহু সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। জেবুন্নেছা বিদ্যাগুণে পণ্ডিতসমাজের মনোহারিণী এবং জ্ঞানের গুণে রাজভবনে সন্ন্যাসিনী ছিলেন। সম্রাট্ আলমগীর এক জন প্রকৃত ধার্ম্মিক এবং আদর্শ রাজনীতিজ্ঞ নরপতি ছিলেন ; তিনি এহেন পূতমনা সুপণ্ডিত কন্যারত্ন লাভ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আবাল্য সন্ন্যাসিনী জেবুন্নেছার অসাধারণ প্রতিভার দুইটি নিদর্শনের উল্লেখ করিতেছি—

শাহীমহলে ও বহির্ব্বাটিতে অধিকাংশ লোক সুন্নি ও কেহ কেহ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের উভয় সম্প্রদায়

মধ্যে পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডা চলিত। সম্রাট্ আলমগীর স্বয়ং সুন্নি ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যম পুত্র বাহাদুর শাহ্‌ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এইরূপে সুন্নিদের প্রতি শিয়াদের আন্তরিক বিদ্বেষ-ভাব বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই বিবাদ মীমাংসা করণার্থে সকলে একমত হইয়া, জেবুন্নেছাকে মধ্যস্থ স্বরূপ নির্ব্বাচিত করিলেন। জেবুন্নেছা ইহার মীমাংসার্থে সুন্নিমতের পোষকতায় বহুবিধ উদাহরণ ও সারগর্ভ উপদেশ এবং শাস্ত্রোক্ত বচনাবলীদ্বারা অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করত, এরূপ একটি অখণ্ডনীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, শিয়াগণ তদুত্তরে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিলেন ; তখন সর্ব্বতোভাবে সুন্নিমতের প্রাধান্যই বলবৎ হইল। শিয়াদের মধ্যে অনেকেই সুন্নিমত অবলম্বন করিলেন। জেবুন্নেছার এই সুসঙ্গত বিরাট ব্যবস্থার তুমুল আন্দোলন অচিরেই চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। এই ব্যবস্থার প্রতিলিপি হিন্দুস্থানেরও সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া ক্রমে ইরান ও তুরানেও কতিপয় প্রতিলিপি সমুপস্থিত হইল। ইরানবাসিগণ এই ব্যবস্থা খণ্ডনার্থে কতরূপ চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তৎকালে জেবুন্নেছার সেই ব্যবস্থা এত দূর কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়াছিল যে,

শিয়া সম্প্রদায়ের আন্তরিক ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

হিন্দুস্থানের মহিলাগণ যে আঙ্গিয়া কুর্ত্তী (কাঁচলী) ব্যবহার করেন, ইহা জেবুন্নেছা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

বিশাল ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাটের অতি আদরের দুহিতা, দেবদুর্লভ নিষ্কাম জীবন কাটাইয়া, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া ২৩ বৎসর কুমারীব্রত পালন করিয়া, সোণার দেবপ্রতিমা, ঐশ্বর্য্যশালিনী, ব্রহ্মচারিণী জেবুন্নেছা হিজরী ১০৭৯ অব্দে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন।

পূতশীলা জেবুন্নেছা বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অতুল সুখস্বচ্ছলতার মধ্যে লালিত পালিত হইলেও তিনি খোদার প্রদত্ত শক্তির অপচয় করেন নাই, বিলাস-ব্যসনে বা আমোদ প্রমোদে কখনও তিনি যোগদান করেন নাই। জেবুন্নেছা শুধু বিদ্যানুরাগিনী ছিলেন, এমন নহে; গুণবান্ ও শিক্ষিত লোকদিগকে তিনি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। তদীয় অর্থে প্রতিপালিত হইয়া বহু ধার্ম্মিক, বহু কবি, বহু লেখক স্বীয় স্বীয় কার্য্যে দেহ-মন ঢালিয়া দিতে পারিয়া যশস্বী ও সম্মানী হইয়া গিয়াছেন। জেবুন্নেছার অর্থ সাহায্যে মোল্লা সাফিউদ্দিন আরজবেগ কাশ্মীরে বসিয়া কোরানের ভাষ্য তফ্‌সিরে কবিরীর অনুবাদ

প্রকাশ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত-সমাজে জেবুন্নেছার প্রভাব এজন্য অনেক অধিক।

রাজনীতিতেও জেবুন্নেছার দক্ষতা অসীম ছিল। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব প্রায় গুরুতর কাজেই এই বুদ্ধিমতী শাহ্জাদীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

জেবুন্নেছা কোরান-শরীফের এক উত্তম ব্যাখ্যা-গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্রাটের আদেশে এই দুরূহ কার্য্য হইতে তিনি অবশেষে নিবৃত্ত হন। জেবুন্নেছা পারস্য ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি উদাস ভাবের বৈরাগ্যপূর্ণ ঈশ-প্রেমময় বহু কবিতামালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সব কবিতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে বড় বড় পণ্ডিতেরও গলদঘর্ম্ম হইতে হয়। রুচির নির্ম্মলতা এবং ভাবার মাধুর্য্যই তাঁহার রচনার বিশেষত্ব। তদীয় কবিতা আজিও পণ্ডিত-সমাজের মুখে মুখে সুর-লয়ে আবৃত্তি হইতেছে। আমরা নিম্নে তাঁহার কতিপয় কবিতা ও উহার সুন্দর অর্থ প্রিয়পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়া এই পুণ্যময়ীর পবিত্র আখ্যায়িকা সমাপ্ত করিলাম।

আদর্শ রমণী

১। গারচে মান্ লায়লী হাস্তাম্,
দেল চুঁ মজনু দার্ হাওয়াস্ত্,
সের্ বসাহ্‌রা মীজনম্ লেকিন্,
হায়া জেঞ্জির পাস্ত্।

যদিও আমি লায়লীর মত, কিন্তু হৃদয় মজনুর ন্যায় বায়ুর ভিতর।—ইচ্ছা হয়, মস্তক উত্তোলন করিয়া বাহির হইয়া পড়ি, কিন্তু লজ্জায় চরণ বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

২। বুল্ বুল্ আজ সাগির্ দিয়ম্
শুদ্ হাম্‌নেশিনে গুল বধাগ্,
দিদার মহব্বত্ কাকিম্
পর্‌ওয়ানা হাম্ সাগির্দে মাস্ত্।

বুল বুল আমার শিষ্যত্ব করিয়া, বাগানে ফুলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে;—মিলন ভালবাসার জিনিষ—(প্রদীপে ঝাঁপ দিয়া যে পতঙ্গ প্রাণ দেয়, সেই) পতঙ্গও আমার শিষ্য।

৩। দখ্‌তরে শাহাম্ ও লেকিন্
রুহ্ মুসাফের আওয়ার্‌দা আম্।
জেব্ ও জিনাত্ বস্ হাস্তিনাম্,
নামে মান্ জেবুন্নেছাস্ত্॥

পাদশাহার দুহিতা বটি, কিন্তু অতিথির ন্যায় প্রাণ লইয়া আছি, সৌন্দর্য্য ও বেশ ভূষা ইহাই আমার যথেষ্ট—আমার নাম জেবুন্নেছা (সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রমণী)।

৪। গুফ্‌তাম্ আজ এতাকে বুতাঁশ্, আয় দেল!
চেহ্ হাসেল্ কর দাই ?
গুফ্‌ত্—মারা হাসেলে জুজ্
নালাহায়ে হায় নিস্ত্।

ভালবাসার অনেক কথাই বলা হইল, কিন্তু হে মন! লাভ কি করিলে? (মন) উত্তর করিল, "অশ্রুমালা ভিন্ন আর কিছুই নয়!"

৫: হারকাস্ দার্ আমদ্ দরি জাহাঁ
আখির্ বমক্‌সদ্‌বহা রসিদ্;
পীর শুদ্ জেবুন্নেছা
উরা খরিদার্ না শুদ্॥

যে কোন ব্যক্তিই এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, সেই নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছে, জেবুন্নেছা বৃদ্ধা হইয়া গেল, কেহ তাহাকে ক্রয় করিল না। অর্থাৎ খোদার প্রিয় এমন কোন কাজ করিতে পারিলেন না যে, তদ্বিনিময়ে তিনি খোদার প্রিয় হইতে পারেন।

এইরূপ অসংখ্য কবিতায় জেবুন্নেছার অগাধ ঈশ-প্রেমের নিদর্শন রহিয়াছে।

উপসংহারে বিদুষী জেবুন্নেছার হিতোপদেশমূলক একটি কবিতার নমুনা দিতেছি।—

আগার্ দুশ্‌মন্ দুতা গার্দাদ্ যে তাজিমাশ্ নশু গাফেল্,
কামাঁ চান্দাঁকে খম গার্দাদ্ মকাশ কার্গর্ আয়েদ্।

অস্যার্থ—যদি তব শত্রুজন, নত হয় কদাচন,
ভুলিওনা তার নম্রতায়;
ধনু যত হয় নত, তাহাতে হ'য়ে সংযত,
বাণ তত দ্রুতগামী হয়।

বীরবালা চাঁদ সুলতানা।

নিজাম শাহ ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। নিজাম শাহ্‌ ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। তিনি শিশুকালে মুসলমান হইয়া দাসরূপে জীবন যাপন করেন। কর্ম্মপটুতাগুণে দিন দিন তিনি সৌভাগ্য সোপানে আরোহণ করেন। নিজাম শাহ্‌ বুদ্ধিমান্‌ কর্ম্মাসক্ত বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি আহ্‌মদ নগরে রাজ্য স্থাপিত করিয়া দৌলতাবাদ আক্রমণ করেন। বীর্য্যশালী নিজাম শাহ্‌ দীর্ঘ সাত বৎসর কাল দৌলতাবাদ অবরোধ রাখিয়া পরে অধিকার করিয়াছিলেন।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে এই সৌভাগ্যশালী পুরুষপ্রবর এক অলোকসামান্যা কন্যারত্ন লাভ করেন। ইঁহারই নাম চাঁদ বিবী। উত্তরকালে তিনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়া চাঁদ সুলতানা নামে কীর্ত্তিশীলা হন।

চাঁদবিবী বীরপুরুষের বীর কন্যা ছিলেন। শৈশব হইতে নিজামশাহ্‌ অতি যত্নের সহিত চাঁদকে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা যত্ন বিফলে যায় নাই। সময়ে বীরাঙ্গনা চাঁদ রণভূমিতে স্বীয় ভুজযুগলের যে ভীম বল প্রদর্শন করিয়া

ছিলেন, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি-গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

বিজাপুর অধিপতি আলী আদীল শাহ চাঁদ বিবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চাঁদ বিবী স্বীয় নারী সুলভগুণে আলী-আদিল শাহের হৃদয় আপনার করিয়া তুলিয়া ছিলেন। চাঁদ বিবী রাজকার্য্যেও যেমন স্বামীর সহায়তা করিতেন, বিপদাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রেও তেমনি স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইতেন। সকলের নিকট সর্ব্ববিধ গুণেই চাঁদ বিবী উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য-শাসনেও তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি ও সুযশঃ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজচক্রবর্ত্তী আকবর তদীয় পুত্র মোরাদকে আহ্‌মদ নগর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। তৎকালে আহ্‌মদ নগরের সিংহাসনে কেহ উপবিষ্ট ছিলেন না; নিজাম শাহ্‌ নিঃসন্তান স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। অতএব আশু বিপদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় নগরের জনসাধারণ একত্র মিলিয়া সর্ব্বগুণশালিনী চাঁদ বিবীকে তদীয় পিতৃরাজ্য রক্ষার জন্য আহ্বান করেন। তখন চাঁদ বিবীর বয়স ছিল পঞ্চাশ বৎসর। তিনি অচিরে আহ্‌মদ নগরে উপনীত হইয়া সৈন্যদলের

নায়কতা গ্রহণ করেন। যুবরাজ মোরাদ, নগর অবরোধ করিয়াও দুর্গ অধিকার করিতে না পারিয়া, শেষে দুর্গ-প্রাচীরের নিম্নভাগে গর্ত্ত খনন করাইয়া প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এবং সেই ভগ্ন-পথ দিয়া দুর্গের ভিতর বেগে সৈন্য চালনা করিতে থাকেন।

স্বাধীনতা-প্রিয় চাঁদ বিবী তখন রণ-রঙ্গিণীবেশে উলঙ্গ তরবারি হাতে সেই গর্ত্তমুখে ছুটিয়া গিয়া ভৈরবীমূর্ত্তিতে অগ্রবর্ত্তী শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন, এই রণচণ্ডীমূর্ত্তির বিভীষিকায় মোরাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পাছে হটিয়া গেল। নগরবাসীরা চাঁদ বিবীকে অসীম সাহসে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া, লজ্জা, ঘৃণা ও ক্রোধে এমনই প্রচণ্ডবেগে মোরাদের সেনা আক্রমণ করিল যে, সৈন্যদল সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিল। সেই রজনীতেই চাঁদ বিবী প্রাচীর-মূল সংস্কার করিয়া ফেলিলেন।

আকবর-পুত্র মোরাদ চাঁদ বিবীর অতুলনীয় সাহস ও কার্য্য-তৎপরতায় ক্ষিপ্রহস্ততা দর্শনে বিস্মিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন। চাঁদ বিবী আহ্‌মদ নগরের গৌরব ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কীর্ত্তি-সম্মানে **গৌরবিনী** হইলেন। এই হইতে চাঁদবিবী **চাঁদ সুলতানা** নামে অভিহিত হন।

আদর্শ রমণী

বঙ্গকবি যথার্থই গাইয়াছেন—

(১)

বীরত্ব-প্রতিভা-দীপ্ত চাঁদ সুলতানা,
মোগল বিস্মিত ভীত হেরি বীরপণা।
বীরাঙ্গনা বীর গর্ব্বে ছাড়িছে হুঙ্কার,
ঝরিছে কৃপাণ অগ্রে দেহ শত শত,
বীর্য্যের উচ্ছ্বাস ভরে
অগ্নিময়ী মূর্ত্তি ধরে
কভু অসি, কভু বর্শা, বন্দুক কখন,
ধরিয়া অরাতিগণে করিছে হনন।

(২)

ভ্রমিছে তুরঙ্গবর অরাতি কাননে,
বিদলিয়া কত বৈরী পদচতুষ্টয়ে,
চাঁদ বিবী পৃষ্ঠ'পরে
ঘন গরজন করে
উৎসাহিত করিতেছে স্বসটক চয়ে,
বিজলী খেলিছে করে ধাঁধিয়া নয়নে।

বীরাঙ্গনা খাওলা।

এই প্রবন্ধে আরবদেশের এক বীররমণীর কথা বলিব। উচ্ছৃখল আরবগণ ঈশ্বর প্রতিজ্ঞাত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) ঐকান্তিক যত্নে একতাপাশে আবদ্ধ হইয়া যখন দুর্গের পর দুর্গ জয় করিয়া দেশের পর দেশ অধিকার করিতেছিলেন, তখন সেই অদ্ভুতকর্ম্মা যোদ্ধাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিনিগণও সমভাবে যুদ্ধ করিতেন। এই সব মহারথীদিগের পুরমহিলাগণও বীরত্বের মহাসম্মানে বিভূষিত হইতে আপন আপন প্রাণ অতি তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। নিম্নে সেই সকল বীর রমণীদিগের মধ্য হইতে খাওলার বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করিতেছি।

হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে প্রথম খলিফা মহানুভব আবুবাকর সিদ্দিক সিরিয়া দেশ জয় করিতে এক দল প্রচণ্ড বাহিনী প্রেরণ করেন। সেই বীরদিগের জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিনিগণও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। বয়তুল হায়াত যুদ্ধে বীরবপু জেরার শক্রহস্তে আবদ্ধ হন।

আরব সেনাপতি মহারথি খালেদ জেরারকে উদ্ধার করিতে ধাবিত হইলে, সেনাদলের পুরোভাগে দেখিতে পাইলেন যে, উন্নত-শরীর-বিশিষ্ট বর্ম্মাবৃত এক ব্যক্তি দীপ্ত দীর্ঘ বর্শা হাতে ধরিয়া গর্ব্বগ্রীব অশ্বারোহণ পূর্ব্বক চলিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ় বর্ম্মের উপরিভাগ কালবস্ত্রে আবৃত ছিল, এবং উত্তরীয় বস্ত্রে কটিবদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থল বেষ্টন পূর্ব্বক উহা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। সেই যোদ্ধার আপাদমস্তকই লৌহবর্ম্মে আচ্ছাদিত ছিল, কেবল তাঁহার উজ্জ্বল নীলাভ নয়ন দুইটি আবরণহীন ছিল। তাঁহার আকারের সুন্দর মহত্ত্ব ও অশ্বচালনার অপূর্ব্ব কৌশলে বীরত্ব-গৌরব প্রকাশ পাইতেছিল। সেনাপতি খালেদ এই অনিন্দ্য বীরের পরিচয় লাভে উৎসুক হইয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না। এদিকে বীরবর রাফেয় রোমকদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছিলেন। খালেদ ত্বরিতপদে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে সেই অজ্ঞাতকুল যোদ্ধা রোমক সৈন্য আক্রমণ করিলেন, তাঁহার সে ভীমবেগে শত্রুগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ক্ষণেকে তিনি নররক্তে বর্শা অভিষেক পূর্ব্বক ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহার তখনকার ভাবে ও কার্য্যে জাজ্জ্বল্যমান বিষাদ প্রকাশ পাইতে ছিল।

আবার তিনি বজ্রবেগে রোমক সৈন্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহার বর্শাঘাতে শত শত বীর ধরাশায়ী হইতে লাগিল। রাফেয় এই অপরিচিত যোদ্ধার আক্রমণের ভীষণতা ও অস্ত্রপরিচালনার পারিপাট্য দেখিয়া ইঁহাকেই সেনা-পতি খালেদ বলিয়া মনে করিলেন।

এই সময় খালেদ সসৈন্যে প্রচণ্ডরূপে আক্রমণ করিলে, সৈন্যতরঙ্গের মধ্যস্থল হইতে সেই যোদ্ধা বাহির হইয়া আসিলেন। খালেদ তাঁহাকে তদীয় নিকটে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তিনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন খালেদই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, তাঁহার বর্ম্মচর্ম্ম প্রভৃতি রক্তে রঞ্জিত। তথাপি বর্ম্মের বিচ্ছেদ স্থান দিয়া তাঁহার কমনীয় দেহের গোলাপী সৌন্দর্য্য-শোভা বাহির হইয়া পড়িতেছে। খালেদ পরিচয় জানিতে আগ্রহান্বিত হইলে, তিনি বলিলেন,—"হে সেনাপতি, আমি রমণী, লজ্জা বশতঃ আপনার সমীপস্থ হই নাই, আমাকে ক্ষমা করুন্। আমি জেরারের ভগ্নী খাওলা। আমি ভ্রাতৃ-শোকে লজ্জাশীলতা ত্যাগ করিয়াছি।" বিস্ময় ও হর্ষে খালেদের শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

অতঃপর খালেদ সমুদায় সৈন্য লইয়া তীব্রতেজে আক্রমণ

করিলেন, এবং খাওলা সকলের পুরোভাগে থাকিয়া অস্ত্র চালনা করিয়া প্রহারে প্রহারে সৈন্যদল মথিত করিতে করিতে ভ্রাতার সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। খাওলার উন্মত্তময় রণচণ্ডীভাব দেখিয়া এবং বিষাদগীতি শুনিয়া আরব-বীরগণ অশ্রুপ্লাবিত বদনে ভীষণ হইতে ভীষণতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিলে, উভয় দল বিশ্রাম আশায় স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। কিন্তু জেরারের কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা। শেষে জানা গেল,—"রোমক সেনাপতির পুত্রহন্তা জেরারকে শত সৈন্যে পরিবেষ্টন করিয়া হেম্‌সে লইয়া যাইতেছে।"

রাফেয় কতিপয় সেনাসহ জেরারকে উদ্ধার করিতে প্রেরিত হইলেন। খাওলাও সেনাপতির আদেশ লইয়া এই সৈন্যদলের সঙ্গিনী হইলেন। রোমকেরা সালমাত নামক স্থানে জেরারকে লইয়া উপস্থিত হইলে, খাওলা উচ্চরবে তক্‌বীর ধ্বনি পূর্ব্বক তাহাদের উপর পতিত হইলেন; রাফেয়ও সৈন্যসহ যোধরাব করিয়া আক্রমণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে রোমকসৈন্য সকল নিহত হইলে, খাওলা জেরারের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাকে

অভিবাদন করিলেন; হাস্যমুখে জেরার মারহাবা বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আর একবার **সহুরার যুদ্ধে** আরব-রমণিগণ বন্দিনী হইয়াছিলেন। তখন মুসলমান সেনানায়ক **দামস্ক** অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক **আজনাদিনে** রোমকসৈন্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করিবার কালে, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া চলিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি **আবুউবিদা** সমস্ত মহিলা, বালক বালিকা, এবং ধন সম্পত্তি ও লুণ্ঠিত দ্রব্য সম্ভারাদি লইয়া ধীরে ধীরে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া ছিলেন। পথিমধ্যে দামস্কের **পিটার** ও **পল** নামক দুই বীরভ্রাতা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। পল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং পিটার স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি আয়ত্ত পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করত দামেস্কের দিকে অগ্রসর হইয়া **ইষ্ক্রিয়াক নদী** তীরে পলের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পিটার ইস্ত্রিয়াকের তীরে উপস্থিত হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য ও আরব রমণীদিগকে সম্মুখে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। পিটার খাওলার অনিন্দ্য রূপলাবণ্য ও সুললিত যৌবন দর্শনে মুগ্ধ প্রাণে সঙ্গীয়দিগকে স্বীয় নীচ অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে,তাহারাও সেনা-

পতির অনুগামী হইল। অতঃপর রমণীদিগকে বিশ্রামার্থ পাঠাইয়া দিল। এই মহিলাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধবিশারদ ছিলেন। বীরাঙ্গনা খাওলা তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলন,—“আরবের বীর-জননী, বীর জায়া ও বীর কন্যাগণ! তোমাদের সেই অসীম বল বিক্রম, অনন্ত খ্যাতি, বংশ মর্য্যাদার উজ্জ্বল গৌরব কি আজ চিরদিনের জন্য কলঙ্ক-কালিমায় ডুবিয়া যাইবে? আরবের উন্নত মহৎ বংশে জন্মলাভ করিয়া কি তোমরা ঘৃণিত হেয়গণের দাসী হইবে? পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্মের আশ্রিতা হইয়া কি তোমরা অস্পর্শীয়দের ক্রীড়ার পুতুল হইবে? মহান্ কোরান-শরীফের মর্ম্মজ্ঞ ও প্রচারক হইয়া কি তোমরা তাহার অপলাপ করিয়া কুৎসিৎ ভাবে জীবন বহন করিবে? এ সব হইতে মৃত্যুই কি আমাদের পক্ষে শ্রেয় নয়? আরব কন্যাগণ! এই দেহ আর জীবন কখনও স্থায়ী নয়, পরকাল স্মরণ কর। জীবনের মায়ায় আজ তোমরা হীনতা স্বীকার করিলেও, কালই তোমাদের এই প্রিয় জীবন পাপে পদানত, রোগে কাতর, এবং শোকে বিষণ্ন হইয়া পড়িবে। জগদীশ্বর মস্তকোপর হইতে আমাদের অবস্থা পরিদর্শন করিতেছেন, সেই অনাথের নাথ বিশ্বপালকই আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন।”

বীরবালার বাক্যে অনল বর্ষিত হইতেছিল, এবং তাঁহার বীরদর্প মুখমণ্ডলে বিদ্যুল্লতা বিকীর্ণ হইতেছিল। খাওলার উত্তেজনায় সকলের হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা বহিতে লাগিল। ওফিরা বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"বীরভগ্নি! আমরা সাহসহীন হই নাই, যুদ্ধ কৌশল ভুলিয়া ফেলি নাই, এবং বল গৌরব বিসর্জ্জন করিয়া বসি নাই; কিন্তু হঠাৎ অস্ত্র ও বাহনহীন অবস্থায় বন্দিনী হওয়ায় বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। এখন মান সম্ভ্রম রক্ষার উপায় কি ভগিণি!"

খাওলা বিজলীর ন্যায় পট্টবস্ত্রের একটা প্রকাণ্ড দণ্ড হস্তে লইয়া বলিলেন,—"ইচ্ছা করিলে তোমরাও এইরূপে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পার।" এই বলিয়া খাওলা সেই দণ্ড স্কন্ধে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ ওকিয়া, কুম্মারী উম্মে এবান প্রভৃতি অপরাপর স্ত্রীলোকেরাও এক একটি দণ্ড হাতে লইয়া ব্যূহ বিন্যাস করিয়া তক্‌বীর ধ্বনি পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। খাওলা আবার মেঘ-গর্জ্জনে বলিলেন,—"সাবধান! তোমরা স্ব স্ব স্থান ত্যাগ করিওনা, একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না, নতুবা রোমকগণের তরবারির ও বর্শার আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িবে।"

অতঃপর খাওলা অগ্রবর্ত্তী হইয়া দণ্ডাঘাতে এক রোমকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। রোমকসৈন্য বিস্মিত নেত্রে আরব রমণীদের অপূর্ব্ব রণবেশ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। পিটার বিরক্ত হইয়া সৈন্যদিগকে আদেশ করিল,--"অস্ত্রাঘাত না করিয়া ইহাদের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া দাও।" রোমকগণ চারিদিক হইতে তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া লইল বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকটে কেহই যাইতে পারিল না। পরন্তু যে কেহই সমীপস্থ হইতে চাহিল, তাহাকেই রণরঙ্গিণী ভৈরবিগণ, কালদণ্ড প্রহারে ভূতলশায়ী করিলেন। এই ভাবে ত্রিশ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিধন প্রাপ্ত হইলে, পিটার স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিরস্ত হইতে বিনয় করিল; কিন্তু খাওলা ঘৃণার সহিত তাহার বিনয় বাক্য প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন পিটার রোষভরে আক্রমণের আদেশ প্রদান করিয়া বলিল,—"হতভাগ্যগণ! এতদিন আরবের বীর পুরুষেরা তোমাদিগকে পরাজিত করিয়াছে, আর আজ তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও তোমাদিগকে পরাজিত করিতেছে। কাপুরুষগণ, ধিক্ তোমাদিগকে।"

রোমকেরা পিটারের ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্যে লজ্জিত হইয়া তীব্র তেজে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দীর্ঘ দীর্ঘ দণ্ডের

ঘন ঘন আঘাতের উপর রোমকদিগের বর্শা ও তরবারির প্রহার ব্যর্থ হইতে লাগিল।

সেই দিকে খালেদ কালানলের ন্যায় পলের সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক তাহাকে বন্দি করিয়া পিটারের উদ্দেশে ধাবমান হইলেন। ইস্ত্রিয়াকের তীরে বিশাল সৈন্যদলের মধ্যস্থলে দণ্ড চালনা হইতেছে দেখিয়া খালেদ বলিলেন,—"এই রমণিগণ আমালেকা ও তাবালিয়া বংশীয়; বহু স্থানে ইঁহাদের বীরত্বের প্রতিপত্তি আছে। আজ যদি তাঁহারা যুদ্ধোদ্যোগ পূর্ব্বক আপনাদের লজ্জা ও সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করিয়াথাকেন, তবে পূর্ব্ব পুরুষদিগের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে; আরব রমণীদের বীরত্বগৌরবে পৃথিবী চমকিত হইবে।"

অনন্তর খালেদ পিটারের সৈন্যে প্রবেশ করিয়া মহাসংহার আরম্ভ করিলেন। খাওলা দণ্ড প্রহারে পিটারের অশ্বপদ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, পিটার ভূপতিত হইল। এই সময় জেরার তাহার কটিতে বর্শা বিদ্ধ করিয়া দিলেন। পিটার ঊর্দ্ধপদে ভূতলশায়ী হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিল।

অতঃপরও খাওলা জীবিত কাল পর্য্যন্ত বহুযুদ্ধে অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

বীর্য্যবতী উম্মে এবান।

বীরবালা খাওলার বীরত্ব-কাহিনীতে এই কুমারী উম্মে এবানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর আজনাদিনের যুদ্ধ দিবস **এবান বেন্সে সাইদ** এর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। ইঁহার বীর্য্যবত্তা অসীম, যুদ্ধ-কৌশল অতুলনীয় ও সাহস অনুপমেয়।

আরবগণ দ্বিতীয়বার দামস্ক অবরোধ করিলে, দামস্ক সম্রাটের জামাতা প্রথিতনামা **বীর টমাস** দুর্গের প্রাচীরোপরি উপবিষ্ট হইয়া শর সন্ধান করিতেছিলেন। তাঁহার শর বিষাক্ত ছিল। সেই বিষমাখা শরে উম্মে এবানের পতি যোদ্ধৃবর এবান আহত হন, সহসা উহার উগ্র হলাহলে তাঁহার সর্ব্ব শরীর অবশ করিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার জীবনপাখী উড়িয়া গেল, দেহ পিঞ্জর শিবিরে পড়িয়া রহিল।

উম্মে এবান এই আকস্মিক দুঃসংবাদে স্খলিতপদে ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর পদমূলে উপবেশন পূর্ব্বক একান্ত ধৈর্য্য চিত্তে, স্থির কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"প্রাণেশ্বর, যাঁহার

অসীম কৌশলে আমরা সৃষ্টি ও মিলিত হইয়া আবার বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, তুমি সেই বিশ্বস্রষ্টার সমীপে মনোরম স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, এখন তাঁহার দয়া বিভাসিত স্বর্গ লোকে অনন্ত সুখে বিচরণ করিবে। তোমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল বটে, কিন্তু অতৃপ্ত হৃদয় তোমার প্রতি অচল অনুরাগী রহিয়াছে। আমিও পরমেশ্বরের নিয়োজিত কর্ম্মে জীবন পাত করিয়া তোমার সঙ্গিনা হইব। বিশ্বপাতার শপথ, অপর পুরুষ আমার জন্য হারাম।” তাঁহার দুইটি চক্ষু হইতে আর এক বিন্দুও অশ্রু পতিত হইল না।

তখনও তাঁহাদের শিরে বিবাহের আতরের সুবাস ও হাতে মেহ্‌দী পাতার রং অবিকৃত ছিল। উম্মে এবান স্বামীর পার্শ্বে আর তিষ্ঠিলেন না, ত্রস্তপদে অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেনাপতির আদেশ না লইয়াই সারহাবিলের সৈন্যে পতিত হইয়া ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। বাণ চালনায় উম্মে এবানের অসীম নৈপুণ্যতা ছিল।

এক ব্যক্তি টমাসের সম্মুখ ভাগে বিশাল ক্রুশ স্থাপন পূর্ব্বিক উচ্চৈঃস্বরে জয় প্রার্থনা করিতেছিল। উম্মে এবান এমনি স্থির লক্ষ্যে তাহার প্রতি বাণ ছুরিলেন যে, তাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। ক্রুশ তাহার হস্তচ্যুত হইয়া প্রাচীরমূলে

লুটাইয়া পড়িল, সেই উজ্জ্বল মণি মাণিক্য বিশিষ্ট ক্রুশ মুসলমানেরা হস্তগত করিয়া ফেলিল।

প্রধান ক্রুশ আরবেরা লইয়া গেলে, টমাস ভীত হইয়া তীক্ষ্ণ ধার খড়গ ও দুর্ভেদ্য চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ছুটিতে ছুটিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যাহার ইচ্ছা হয়, সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া চলিয়া আইস। আরবদিগকে সমূলে ধ্বংস করিয়া ক্রুশ উদ্ধার না করিলে আমাদের নিস্তার নাই।" টমাসের বীরত্ব ও পরাক্রমের বিশেষ খ্যাতি ছিল, সুতরাং রোমকেরা উৎসাহ ভরে তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

চকিতে রোমকেরা দুর্গের দ্বার খুলিয়া ক্ষুধার্থ ব্যাঘ্রের ন্যায় আরবদিগের উপর পতিত হইল। আরবেরাও উন্মত্ত সিংহের মত আক্রমণ করিলেন। টমাস মুসলমান ব্যূহ বিদীর্ণ করিয়া পাগল প্রায় ক্রুশের সন্ধান করিতে ছিলেন। টমাসকে ক্ষীপ্তবৎ দেখিয়া উম্মে এবান পার্শ্বের সেনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাণের মায়াহীন এই উন্মাদ কে?" তাঁহারা বলিলেন, "ইনিই সম্রাটের জামাতা, তোমার স্বামী ঘাতক টমাস।" উম্মে এবান ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া বিদ্যুতের ন্যায় টমাসের দিকে ধাবিত হইলেন, রোমক সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে গর্জ্জিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতে

অগ্রসর হইল,তিনি তাহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না ; এবং আকর্ণশিঞ্জিনী আকর্ষণ করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন। টমাস ক্রুশ উদ্ধার করিবেন, এমন সময় সহসা উম্মে এবানের সেই তীক্ষ্ণ তীর তাঁহার দক্ষিণ চক্ষুতে বিদ্ধ হইল, টমাস ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে ঢালে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক পলায়ন করিল। উম্মে এবান আর এক ব্যক্তিকে দুই তীরে নিহত করিয়া পরম্পরায় রোমক সেনাদিগকে জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলিলেন। আরবেরা রোমকদিগকে সংহার করিতে করিতে দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিলেন। তিন শত রোমক বীরের শরে দুর্গ দ্বার সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

টমাস দুর্গে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ হইলে, প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও ভীষকেরা মিলিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার চক্ষু হইতে বাণ বাহির করিতে পারিলেন না। অনন্তর শরের কাষ্ঠভাগ কাটিয়া ফেলিয়া আহত স্থান বাঁধিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু লৌহ ফলক চক্ষুর মধ্যে থাকায় তীব্র বেদনার লাঘব হইল না। প্রধানবর্গ বলিলেন,—"আমরা আরবদের সৌর্য্যবীর্য্য পরিজ্ঞাত হইয়াই সন্ধির কথা বলিয়াছিলাম।" টমাস বলিলেন,—"তোমাদের এই কাপুরুষতার জন্যই শ্রেষ্ঠ ক্রুশ

বিপক্ষের হস্তগত হইয়াছে ; আর আমার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে। আমি নিশ্চয়ই ক্রুশ উদ্ধার করিয়া আমার এক চক্ষুর জন্য সহস্র চক্ষু গ্রহণ করিব।" টমাস রোষাবেশে তখনই যোদ্ধাদিগকে ডাকিয়া আক্রমণের আদেশ দিলেন।

দিবসের তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অতঃপর আরব বীরগণ বিরাম করিয়াছিলেন। টমাস রাত্রিকালে সেই নিদ্রিত আরবদিগকে আক্রমণ করিলেন।

টমাস দুর্গ হইতে বহির্গত হইবার কালের ঘণ্টা ধ্বনি ও দুর্গদ্বার খুলিবার কর্কশ শব্দে মুসলমান যোদ্ধৃগণ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইতে না হইতেই আক্রান্ত হইলেন। গভীর আঁধারে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। কৃপাণ ও বর্শার আঘাতের কেবল বিজলী দেখা যাইতে লাগিল।

টমাস ক্রুশ অপহারী বীরবর শারহাবিলের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। উম্মে এবান শারহাবিলের সন্নিহিত দাঁড়াইয়া অলক্ষ্যভেদে শর পরিচালনা করিতে ছিলেন ; তাঁহার প্রত্যেক বাণ বিপুল বাহুবল সম্পন্ন ছিল বলিয়া যাহার শরীরেই বিদ্ধ হইত, তাহাকেই ধরাশায়ী করিত। উম্মে এবানকে রোমকেরা পুরুষ বলিয়া জানিত। ক্রমে ক্রমে তাঁহার তূণীর

খালি হইয়া, মাত্র একটি বাণ হাতে থাকিতে, এক রোমক বীর তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি হাতের শেষ বাণটি শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ; তাহার বক্ষ ভেদ হইয়া গেল, সে উৎকট চীৎকারে ভূপতিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কিন্তু উম্মে এবান নিরস্ত্র হইয়া বন্দিনী হইলেন। এই সময় বীরবাহু আবদুর্ রহমান ও এবান বেম্নে উসমান তীব্রতেজে উপস্থিত হইয়া উম্মে এবানকে মুক্ত করিয়া টমাসের উপর পতিত হইলেন। সহসা মুসলমানেরা নূতন সৈন্যে বলীয়ান হইয়া উঠিলে, টমাস দুর্গে পলায়ন করিলেন।

এই রাত্রিতে বহু সহস্র রোমকসৈন্য বিনাশ হইয়া গেল। তাহাদের বল ও সাহস নষ্ট হওয়ায় তাহারা পুনরায় যুদ্ধ করিতে পারিল না। পরদিন তাহারা আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক আরবদিগের সহিত সন্ধি করিয়া দেশান্তরিত হইয়া গেল। এইরূপে বল-দৃপ্ত, জয়গর্ব্বিত মহাসামন্ত খালেদের দ্বারা দামেস্ক বিজয় সম্পন্ন হইল। অপর এক যুদ্ধে খালেদের হাতে এই টমাসের মৃত্যু ঘটে।

উম্মে এবান অবশিষ্ট জীবন এইভাবে যুদ্ধ করিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। খাওলা ও উম্মে এবানের জীবন সার্থক হইয়াছে,

তাঁহারা আরব রমণীদিগের--সমগ্র মুসলমান মহিলাকুলের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। আজিও আরবের আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভক্তি, সম্মান, এবং কৃতজ্ঞতার সহিত খাওলা ও উম্মে এবানের নাম করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন, আর তাঁহাদের কীর্ত্তি ও যশঃ পৃথিবীতে বিরাজ করিতেছে। ধন্য আরব! আর ধন্য সেই আরবের মহিলা!!

উম্মুল বানিন।

দামস্কের সিংহাসনে খলিফা প্রথম অলিদ ৮৬ হিজরী (৭০৫ খৃঃ) অব্দে উপবেশন করেন। এই সময়ই মুসলমান-সাম্রাজ্য অপূর্ব্ব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইউরোপে ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ ও সমস্ত স্পেন, এবং পর্টুগাল মুসলমানদিগের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। আর ভূমধ্যসাগরের দ্বীপাদির মধ্যে মেজর্কা, মিনার্কা, ইদিসা, কর্সিকা,সার্দ্দিনীয়া,ক্রীট, রোদ্‌সা, সাইপ্রস প্রভৃতি সমগ্র দ্বীপ ও সিসিলী দ্বীপের অর্দ্ধাংশ এবং গ্রীসের সমীপস্থ দ্বীপাবলীর অধিকাংশই মুসলমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আফ্রিকার পশ্চিমদিকস্থ জিব্রাল্টার হইতে পূর্ব্ব ভাগের সুয়েজ যোজক অবধি, এবং এশিয়ার পশ্চিমস্থিত মিনাইর মরুভূমি হইতে পূর্ব্বে মঙ্গোলিয়ার প্রান্তরসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে মুসলমানদের বিজয়গর্ব্বিত পতাকা উন্নত শিরে উড়িয়াছিল। কিন্তু হায়, মোস্লেম রাজ্যের এই বিস্তৃতির সময় খলিফা অলিদ দুর্নীতিপরায়ণতা বশতঃ প্রকৃতিপুঞ্জকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলিয়া ছিলেন। বিশেষতঃ এরাক প্রদেশের গবর্ণর হাজ্জাজ খলিফাকে নিষ্ঠুর হত্যা ও নানাবিধ দুষ্কার্য্যে

উৎসাহিত করিয়াছিলেন। শেষে খলিফা সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ মানসে গরীব দুঃখীদিগের জন্য নানারূপ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, কিন্তু চঞ্চলমতি বশতঃ সময় সময় নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতেন বলিয়া জনমণ্ডলীর ভালবাসা লাভ করিতে পারেন নাই।

এই সময় এক পূতশীলা ধার্ম্মিকা রমণী স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণদর্শিতায়, এবং দয়া ও প্রেমপ্রবণতায়, আরবের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। এই শক্তি শালিনী মহিলা খলিফা দ্বিতীয় উমরের ভগিনী এবং খলিফা প্রথম অলিদের সহধর্ম্মিণী **উম্মুল বানিন**। আজ কত শত বৎসর চলিয়া যাইতেছে, স্নেহবৎসলা উম্মুল বানিন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তদীয় একটি **উপদেশ** ইতিহাসের বুকে জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত থাকিয়া তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছে।

উম্মুল বানিন বড়ই কোমলপ্রাণা রমণী ছিলেন ; তিনি কুটিল রাজনীতিপরায়ণ খলিফা অলিদের নির্দ্দয় ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়া অস্থির হইতেন। মাতৃপ্রাণা উম্মুল বানিন দিবানিশি প্রজাদিগের মঙ্গল চেষ্টায় ব্যাকুল থাকিতেন। হাত যোড় করিয়া, জানু পাতিয়া কুহেলিকাময় শাসনদণ্ডের কবল হইতে তিনি অনেক হতভাগ্যেরই জীবন ভিক্ষা করিয়া লইয়া-

ছিলেন। শেষে যখন জানিতে পারিলেন যে, এরাক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পাপাত্মা হাজ্জাজ খলিফাকে এই কু-প্রবৃত্তিতে প্রীতি জন্মাইতেছেন, তখন তিনি হাজ্জাজকে এক দিন ডাকিয়া তিরস্কার চ্ছলে এই উপদেশ প্রদান করিলেন,—"হাজ্জাজ, তুমি এরাকের গবর্ণর, সুতরাং তোমার মান সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি কোন অংশে কম নয়; তুমি ইচ্ছা করিলে এই অবস্থায় বহু সৎ কাজ, মহান্ উচ্চ কীর্ত্তি রাখিয়া অসীম খ্যাতি উপার্জ্জন করিতে পার। তোমার ইচ্ছা সৎ, হৃদয় নির্ম্মল, উৎসাহ স্বার্থ-হীন ও কর্ম্ম কলঙ্ক হীন হইলে, আজ খলিফা এমন দুর্ম্মতিশীল হইতেন না; আর বিশাল মোস্লেম সাম্রাজ্যের পতন নিকটবর্ত্তী হইত না। পরিতাপের বিষয় যে, তুমি এমনই স্বার্থে অন্ধ যে, কেবল তোমারই কু-পরামর্শে খলিফা মতিচ্ছন্ন হইয়াছেন, এবং মোস্লেম সাম্রাজ্য ধ্বংসের মুখে পতিত হইতেছে; তুমি তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছ না হাজ্জাজ! নিষ্ঠুর হাজ্জাজ, দেশের প্রধান প্রধান ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানদিগকে নিহত করাইয়া কি লাভ করিয়াছ, বলিতে পার হাজ্জাজ! পরন্তু এই পৈশাচিক কর্ম্মে যে অগাধ পাপ সঞ্চয় করিয়া পরকালের পথ কণ্টকপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছ, তাহা এক বার চিন্তা করিয়াছ

হাজ্জাজ! স্বার্থলুব্ধ হাজ্জাজ, এই জীবন কত ক্ষণের, তাহা কি বারেক ভাবিয়া কর্ম্মে হাত দিয়াছ? হায় মূর্খ! তুমি মুসলমান হইয়া কোন্ প্রাণে খলিফাকে উত্তেজিত করিয়া এমন লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করাইয়া, তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্ত্তায় পরিণত করিলে? তোমার এই দুশ্চরিত্রের শাস্তি ইহকালে হইতে পারে না, পরকালে যম রাজার হাতে হইবে! তোমার এই কলুষ দুষ্ক্রিয়ার প্রতিফল ভীষণ নরক!! পাপিষ্ঠ, শীঘ্র রাজ-দরবার হইতে দূর হ!!!

পরিশেষে এই চারুশীলা রমণী খলিফাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া ও সর্ব্বদা হিতোপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার দোষ ছাড়াইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার সে চেষ্টা সফলও হইয়াছিল। উম্মুলবানিনের গাঢ় ভালবাসা ও প্রীতিপ্রফুল্ল প্রেমমাখা উপদেশ খলিফা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারই সৎপরামর্শে খলিফা অলিদ মদিনা ও জেরুসালম মস্‌জেদ এবং দামস্কের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মস্‌জেদটির সৌন্দর্য্য ও আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অনেক নূতন স্থানে মসজেদ নির্ম্মাণ এবং সমস্ত দেশে প্রশস্ত ও দীর্ঘ দীর্ঘ পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খলিফা এই পথগুলির পার্শ্বে পার্শ্বে রাশি রাশি কূপ খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া

পথিকদিগের পিপাসা নিবারণের চূড়ান্ত সুবিধা ঘটিয়াছিল। সীমা ও দেশ রক্ষার জন্য অনেক দুর্গও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অন্ধ, পঙ্গু ও উন্মাদদিগের জন্য আহার ও বাসের আশ্রম প্রতিষ্ঠা করায় লোক শিক্ষিত হইতেছিল, উপায়হীনেরা প্রাণে বাঁচিতে ছিল। রাজকোষ হইতে দরিদ্র এবং পীড়িত ব্যক্তির জন্য বৃত্তি পাইবার ব্যবস্থা হইল। পিতৃমাতৃ হীন অনাথ বালক বালিকা শিক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবার জন্য অনাথাশ্রম স্থাপিত হইল।

এই তেজস্বী রমণী দুর্দ্দান্ত খলিফা প্রথম অলিদের হৃদয় আপন বশে আনিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন বলিয়া, খলিফার দ্বারা এতগুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। উম্মুলবানিন পর্দ্দানিশীন রমণী হইলেও বিবেক ও তীক্ষ্ণদর্শিতায় অনেক পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি কামিনী-সুলভ কোমল দেহ-বিশিষ্ট হইলেও বীরের ন্যায় কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য ইতিহাসের বুকে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়া।

হাদিস শরীফে উল্লিখিত আছে,—"মানুষ প্রথম খোদার প্রীতিভাজন হইয়া, পরে পৃথিবীর সকলের প্রিয়পাত্র হয়।"

আল্লার স্নেহ লাভ ও সংসারের যশঃ মান অর্জ্জন,—বিদ্যা ও সৎবুদ্ধি দ্বারা হয়। সৌন্দর্য্য সম্ভারে ইহা পাওয়া যায়না, ধন সম্পত্তিতেও ইহা ক্রয় করিতে মিলে না, এবং বল বিক্রমেও ইহা হস্তগত হয় না, ইহা প্রাপ্তির একমাত্র উপায় **পুণ্য**।

প্রাচীন মিসর দেসের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, **ফেরউন** কেমন শক্তিশালী সম্রাট্ ছিল, এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তুল্য **হাম্মান** তাহার মন্ত্রী ছিল। আবার **কারুন** সৌন্দর্য্য লালিত্যে ও ধন সম্পত্তিতে অতুলনীয় ছিল, কিন্তু তাহারা কেহই পৃথিবীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারিল না। কেননা, তাহাদের অপরিমিত বল, অগাধ বুদ্ধিকৌশল, মনোলোভা সৌন্দর্য্য, অসীম সম্পত্তি সমস্তই সৎপথে খরচ হয় নাই; সুতরাং তাহারা খোদার প্রিয় হইবার জন্য চেষ্টা যত্ন করে নাই। এই জন্য তাহারা ঐশ্বর্য্যশালী, বীর্য্যশালী, সৌন্দর্য্যশীল হইয়াও ঘৃণার পাত্র।

এই ইতিহাস বিশ্রুত মিসর দেশেরই এক সামান্যা প্রবাসী রমণী বিশ্ববরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার না ছিল ধন, না ছিল বল, আর না ছিল লাল টুক্‌টুকে রঙ্গ, কিন্তু পবিত্রতায়, সরলতায় ও সততায় এবং ঈশপ্রেমে তিনি রমণী সমাজে মহারাণী স্বরূপা ছিলেন বলিয়াই আজ একাদশ শত বৎসর অতীত হইয়া গেলেও তিনি সকলের নিকট সমান আদৃতা ও সম্মানীতা দেবী।

মিসরে আরো বহু সাধু তপস্বী সমাধিস্থ হইয়াছেন, প্রবন্ধোক্ত দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার সমাধির ন্যায় কাহারো সমাধিই গৌরবান্বিত নয়। কথিত আছে,—সাধু দর্‌বেশদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তির সমাধিই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ তীর্থ-পীঠ। পুরুষের মধ্যে খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তীর (রঃ) মাজার (সমাধি), এবং রমণীর মধ্যে হজরত সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার মাজার।

সৈয়েদা নফ্‌সিয়া হিজরী ১৩৪ অব্দে মদিনা-শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশব কালে প্রথম তিনি কোরান-শরীফ শিক্ষা করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার সহিত জ্ঞান লিপ্সাও বলবতী হইয়া উঠে; অচিরে

তিনি বিশাল হাদিস* সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি হাদিস সমূহ কেবল পাঠ করিয়াই তৃপ্তি লাভ করেন নাই, প্রত্যেকটি হাদিস কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলেন। একটি হাদিসও তিনি মুখস্থ করিতে বাকী রাখেন নাই। রমণী সমাজে এরূপ অসম্ভাবনী ক্ষমতা আর দেখা যায়না।

হিজরী ১৫০ সালে **বাগ্দাদের খলিফা আবু জা'ফর মন্সুর** দেবী সৈয়েদা নফ্সিয়ার পিতা মহাত্মা হাসানকে মদিনার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। হাসান হজরত আলীর বংশধর ছিলেন।

এই বৎসর প্রসিদ্ধ ইমাম জা'ফর সাদেকের পুত্র **ইস্হাক মোতমনের** সহিত ১৬ বৎসর বয়সে সৈয়েদা নফ্সিয়ার **শুভ বিবাহ** ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইস্হাক মোতমন হজরতের বংশবতংশ ছিলেন। তিনিও বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন সাধু পুরুষ ছিলেন। ইস্হাক মোতমন সৈয়েদা নফ্সিয়াকে মক্কা-শরীফে লইয়া যান।

হিজরী ১৫৬ সালে আরব দেশের রাজনৈতিক গগনে কাল-ছায়ার রেখাপাত হয়। তাহার ফলে বাগদাদের খলিফাগণ

---

* হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মুখনিঃসৃত উপদেশাবলী হাদিস নামে অভিহিত। অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাদিসের ছয়টি গ্রন্থ।

হজরত আলীর বংশাবলীর বিরুদ্ধাদী হইয়া উঠেন। এই মনোমালিন্যের শেষ পরিণাম ভীষণরূপে দেখা দিল। সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার পিতা বৃদ্ধ হাসান সমস্ত ধন সম্পত্তিসহ কারারুদ্ধ হইলেন।

কিন্তু দুই বৎসর গত হইলে হাসানের ভাগ্যচক্র কাটিয়া গেল। ১৫৮ অব্দে খলিফা মন্সুর কাল কবলিত হইলে তদীয় পুত্র মেহদ্দী সিংহাসনারোহণ করিলেন। খলিফা মেহ্‌দী হাসানকে তাঁহার ধন দ্রব্যসহ মুক্তি দিয়া পুনশ্চ পূর্ব্ব মন্ত্রীত্ব পদে নিযুক্ত করিয়া সন্নিকটে রাখিলেন। হাসান অতি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিদ্যা, বুদ্ধি ও সততা নম্রতায় হাসান একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দশ বৎসর খলিফা মেহ্‌দীর উজিরী করিয়াছিলেন। ১৬৮ সালে খলিফা মেহ্‌দী হজ্জ করিতে যাত্রা করিলে, বৃদ্ধ হাসানও তদীয় সঙ্গে হজ্জ করিতে গমন করেন; কিন্তু পথি মধ্যে তিনি হাজর নামক স্থানে ৮৫ বৎসর বয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

পিতৃহীনা হইয়া সৈয়দা নফ্‌সিয়া স্বামী সহ মিসরে চলিয়া আসেন। মিসরেই তিনি অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তখন উলবী বংশীয়গণ খলিফার অধিক বিশ্বস্ত হইয়া উঠিলে,

তাঁহারা মক্কায় বাস করা নিরাপদ মনে করেন নাই বলিয়া মিসরে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়া মিসরে পদার্পন করিতেই তাঁহার গুণ-গ্রামের বিষয় গৃহে গৃহে প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং তিনি শেষ পায়গাম্বরের বংশীয় বলিয়াও সমস্ত মিসর তাঁহার অনুগত হইয়া উঠিল। মিসরের শাসনদণ্ড পরিচালক, ইস্‌হাক মোতমনকে মাসিক মোসাহেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। এতদ্ব্যতীত দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিও খলিফা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহারা সহসা অতুল সম্পত্তিশালিনী হইয়া উঠিলেও নিজেদের দীনবেশ পরিত্যাগ করেন নাই। ধন দিয়া দরিদ্র, ভিখারী, অনাথ, এবং বিধবা নারীদিগকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহাদের এই সময়ের দান-দক্ষিণায় শহর হাস্য-মুখরিত হইয়া উঠিল।

ইমাম শাফিই সর্ব্বদাই দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার সমীপে উপস্থিত হইয়া হাদিস শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। ইমাম শাফিই অদ্বিতীয় বিদ্বান ছিলেন, অথচ তিনি সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার উপদেশের জন্য উৎকণ্ঠিত হইতেন।

দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার উপর ইমাম শাফিইর এমনই ভক্তি ছিল যে, ২০৪ সালে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন, তখন বলিয়া ছিলেন, "আমার মৃত্যু হইলে, শহরের শাসন-কর্ত্তা যেন আমাকে গোসল* দেন, এবং প্রথমে দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়া যেন আমার জানাজা † পড়েন।" ইহাতেও সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার জ্বলন্ত গৌরব প্রকাশ পাইতেছে।

হিজরী ২০৮ সালের রমজান মাসে ৭৪ বৎসর বয়সে এই রমণী-কুল-রাণী স্বর্গারোহণ করেন। তদীয় স্বামী ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পবিত্র শব মদিনায় লইয়া গিয়া গোর দেন; কিন্তু মিসরবাসিগণ নিবেদন করিল,—"মহাত্মন্, আপনি আমাদিগকে খোদার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না।" অতঃপর মিসরের দারাবুস্‌সারা নামক স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

মিসরের ফাতেমা, আব্বাসীয়া, চরকাসী প্রভৃতি বংশীয় নরপতিগণ দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার মাজারের সন্নিকটে

---

* স্নান

† অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে জানাজা বলে। মৃত্যু হইলে, এইরূপেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল।

সমাধিস্থ হওয়া নিরাপদ ও পরিত্রাণের কারণ বলিয়া মানিতেন। পূর্ব্বতন বহু খলিফা, আমীর ও উমরাহগণের শব দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার পার্শ্বেই গোর দেওয়া হইয়াছে। সংসারবিরাগী, সাধু, সাধক, প্রভৃতি বহু লোক সর্ব্বদাই তদীয় কবর পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন।

সমাধি ইষ্টক দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। ৭৩৫ সালে মালেক নাসের এই সমাধিসৌধ উৎকৃষ্টরূপে বারেন্দা (মেহ্‌রাব) সহ সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

৬২৫ অব্দে মালেক আশরফ খলিল সমাধির সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া ফ্রি মাদ্‌রাসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি উহার.খরচ নির্ব্বাহের জন্য বহু ভূমিও দান করিয়া গিয়াছেন।

৭৭৩ অব্দে সয়ফুদ্দিন কাইতাবা মিসরের সিংহাসনারোহণ করিয়া দেবী সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার জন্মোৎসব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। এই মহোৎসবে চারি মজহারের কাজী, মৌলভী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, এবং বহু দূরদেশ হইতেও লোক আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। খলিফার পক্ষ হইতে সকলকেই উত্তম আহার্য্য সামগ্রী প্রদান করা হইয়াছিল।

নারী শ্রেষ্ঠা সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার গোরস্থানের বহু অলৌকিক ক্রিয়াও প্রকাশিত আছে। আমরা নিম্নে তাহার একটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই আখ্যায়িকা শেষ করিব।

৯২৬ অব্দে মহিয়দ্দিন নামক বণিকের সাত বৎসরের এক বালক খেলা করিতে করিতে গৃহপ্রাঙ্গন ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। সেই বালকের মাথায় এরাকদেশীয় বহুমূল্য একটি জরীর টুপী ছিল। বালক খেলার নেশায় বিভোর হইয়া ক্রমে ক্রমে আরও দূরে এক পটাস বিক্রেতার দোকানের সম্মুখে গিয়া উপনীত হয়। লোভী পটাসবিক্রেতা জরীর টুপী হস্তগত করিবার লালসায়, তাহার হাবসী গোলাম সহ সেই বণিক-নন্দনকে ছলে ভুলাইয়া, সৈয়েদা নফ্‌সিয়ার সমাধির নিকটে লইয়া যায়, এবং তথায় এক সঙ্কীর্ণ স্থানে বালককে ছুরির আঘাতে মৃত্যুপ্রায় করিয়া টুপী লইয়া পলায়ন করে।

এদিকে সন্তানকে না দেখিয়া বণিক তাহার অন্বেষনার্থ চারিদিকে লোক পাঠাইল। যখন তালাস করিয়াও বালককে কোথাও পাওয়া গেল না, তখন বণিক ভাবিল যে, কোন দুষ্ট লোক টুপীর লোভে বালককে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বণিক শহরের বড় বড় দোকানদারদিগকে

ডাকিয়া অনুরোধ করিল, "আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার একমাত্র শিশু সন্তান হারাণো গিয়াছে। তাহার মস্তকে জরীর টুপী ছিল। কেহ আজ তোমাদিগের নিকট জরীর টুপী বিক্রয় করিতে আসিলে, তখনই আমাকে খবর দিবে।"

সন্ধ্যাকালে সেই পটাসবিক্রেতা জরীর টুপী বিক্রয় করিতে এক দোকানে উপস্থিত হইল। টুপীর দাম এক শত টাকা ঠিক করিয়া দোকানদার বলিল, "আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই, সুতরাং চিনিতে পারিতেছি না; বিশেষতঃ ইহা চোরাই মাল কি না, তাহাই বা কি করিয়া জানিব? অতএব তুমি এক জন সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারা তোমার পরিচয় দাও।" তখন সেই ব্যক্তি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দোকানদার তাহার ভাবদর্শনে সন্দেহযুক্ত হইয়া সত্বর এই সংবাদ পুত্রহারা বণিকের নিকট প্রেরণ করিল। বণিক দৌড়িয়া আসিয়া টুপী দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিল। পুলিশ চোরকে ধরিয়া লইয়া গেল। শেষে পুলিশ চোরকে শাসন করিলে, সে বালককে হত্যা করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল।

অবশেষে চোরসহ হত্যা ভূমিতে গিয়া সকলেই দেখে যে, বালক তখনো বাঁচিয়া আছে। বণিক পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া

বালককে কোলে করিয়া বাড়ী ফিরিল, এবং কিছু দিন চিকিৎসার পর বালক আরোগ্য লাভ করিল।

সেই বালক স্বীয় মুখে প্রকাশ করিয়াছে, "আমাকে ছুরি মারিয়া ফেলিয়া গেলে, এক সাদা বসন-পরিবৃতা রমণী আমাকে কোলে লইয়া সান্ত্বনা দিতে ছিলেন, আর আমার শরীরের রক্ত ও ধূলি বালি পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে বলিতে ছিলেন, "বাছা, তুই কোন চিন্তা করিস্‌নে, তোরে সন্ধ্যাকালে তোর মার নিকট পাঠাইয়া দিব।

আমি তাঁহার স্নেহমাখা মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।"

দেবী ফাতেমা।

ললনাগণ মানব জীবন অলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত করেন এবং তাঁহাদের মোহিনী-শক্তি, বিচিত্র মহিমা, কোমল ব্যবহার ও মিষ্ট-সম্ভাষণ দ্বারা জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠে। পুরাকালের উজ্জ্বল অলঙ্কার স্বরূপিণী দেবী ফাতেমা, বাস্তবিক-পক্ষেই পৃথিবীর উপকারের জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রস্তাবের শিরোভাগে লিখিত, দেবী ফাতেমার নাম ইস্‌লাম-জগতের আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, সকলের নিকটই সুপরিচিত; কিন্তু তাঁহার অমানুষিক মহত্ত্বের বিষয় অনেকেই সম্পূর্ণ অবগত নহেন।

ক্ষণজন্মা বিদুষী দেবী ফাতেমা পবিত্রভূমি মক্কা-নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইস্‌লামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জ্যেষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম দেবী খোদিজা। ৬২৪খৃঃ ৪ঠা শওয়াল মাসে মহাপুরুষ হজরতের আদেশক্রমে বীর-কেশরী ধর্ম্মাত্মা আলী তাঁহাকে পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করেন। মহাত্মা আলী যেমনি গুণবান্, তেমনি রূপবান্ সুপুরুষ ছিলেন। তিনি পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, আতিথেয়তা, দয়া ও সৎসাহস প্রভৃতি গুনের অবতার-স্বরূপ ছিলেন।

ফাতেমা দেবীও নানা গুণে বিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার হৃদয় এমনই কোমল, এমনই দয়াপ্রবণ ছিল যে, দুঃখীর দুঃখে তাঁহার কোমল অন্তর ফাটিয়া যাইত, শোকার্ত্ত জনের আর্ত্তনাদ শুনিলে তিনি এতই বিচলিত হইতেন যে, তাঁহাকে সান্ত্বনা না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। রোগীর শীর্ণকায় মলিন মুখ দর্শন করিলে তিনি ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন, এবং শুশ্রূষা দ্বারা সেই হতভাগ্যজনের ভগ্নদেহ সবল ও সুস্থ করিয়া দিতেন।

ললনার অত্যুচ্চ গুণসকল তাঁহার কোমল স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। দেবী ফাতেমার চরিত্র বড়ই সুন্দর। তিনি জগতের আদর্শ-রমণী। বিদ্যার গৌরবে এবং সত্যসনাতন ধর্ম্মের আলোকে একদিকে তিনি যেমন মহীয়সী অপরদিকে তেমনি পবিত্রতার আদর্শে গরীয়সী। স্বামীর প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি কখনও স্বামীর অবাধ্য আচরণ করেন নাই। সর্ব্বদাই স্বামীর উপর নির্ভর করিতেন। স্বামী আহার করিলে তিনিও আহার করিতেন, স্বামী উপবাসী থাকিলে তিনিও উপবাস করিতেন।

ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার অটল ভক্তি ছিল। তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের ধ্যানে রত থাকিয়া উপাসনা, উপবাস করিতেন। তিনি

পরমেশ্বরের সামান্য আদেশ পালনেও অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। সর্ব্বদাই শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ধর্ম্মজগতের একচ্ছত্রসম্রাট-তনয়া হইয়াও তিনি কাঙ্গালিনীর মত কালযাপন করিতেন

অসাধারণ মানসিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেবী ফাতেমার অন্তঃকরণের মহত্ত্ব শৈশবকালেই পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। দীন-দুঃখী লোকদিগকে দেখিয়া, তিনি ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তিনি অনেক সময় উপবাস থাকিয়াও স্বীয় খাদ্য দ্রব্য ক্ষুধার্ত্তকে দান করিতেন।

কোন সময়ে মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রিয়তমা দুহিতা দেবী ফাতেমার দর্শনাভিলাষে তদীয় ভবনে উপস্থিত হন; গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াই দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রাণ-প্রতিম দৌহিত্র ইমাম হাসান এবং ইমাম হুসাইন (রাঃ) কঠোর ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। তাঁহাদের শরদিন্দুনিভ কমনীয় মুখমণ্ডল, ব্যাধিরূপ রাহু-কবলে নিপতিত হইয়া নিস্প্রভ ও মলিন হইয়াছে, চক্ষু দু'টি কোটরগত, শরীর কৃষ্ণপক্ষীয় শশাঙ্কের ন্যায় ক্ষীণ হইয়াছে। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শনে তিনি দুঃখিত মনে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেবী ফাতেমাকে বলি-

লেন, - "তুমি ইহাদের আরোগ্য কামনায় উপবাস ব্রত অবলম্বন কর।" ইহা শ্রবণ করিয়া দেবী ফাতেমা ও বীর-কেশরী আলী (শেরে খোদা) উভয়েই উপবাসব্রত প্রতিপালন করিবার মনস্থ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা আলী ও দেবী ফাতেমা প্রফুল্লান্তঃকরণে উপবাসব্রত প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। খোদার কৃপায় উভয় ভ্রাতা হাসান ও হুসাইন রোগমুক্ত হইলেন।

উপবাসের প্রথমদিন ধর্ম্মাত্মা আলী নিজ শ্রমার্জ্জিত ধনে কয়েক খণ্ড রুটি ক্রয় করিয়া ফাতেমার করে সমর্পণ করিলেন। তাঁহারা উপবাসান্তে সায়ংকালে যখন আহার করিতে উদ্যত হইবেন; এমন সময় এক ক্ষুধার্ত্ত দুঃখী অতিথি আসিয়া স্বীয় জঠর জ্বালা জ্ঞাপন করিল। অতিথি-ভক্ত ধর্ম্মাত্মা আলী এবং পরদুঃখকাতরা দেবী ফাতেমা স্ব স্ব রুটি অভ্যাগত অতিথিকে দান করিয়া হৃষ্টমনে জল পান করিয়া যামিনী যাপন করিলেন। তৎপর দিবসও যথারীতি তাঁহারা উপবাস করিলেন এবং সায়ংকালীন ভোজনের নিমিত্ত আহারাদি প্রস্তুত করিলেন। দিবা বসানে যখন আহারের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময় পূর্ব্বদিবসের ন্যায় এক ক্ষুধার্ত্ত অতিথি উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া আপনাদের আহার্য্য সমস্তই অতিথিকে

প্রদান করিলেন। পূর্ব্বরজনীর ন্যায় এ রজনীতেও মাত্র জল পান করিয়া প্রফুল্লচিত্তে রাত্রি কাটাইলেন।

তৃতীয় দিবস দেবী ফাতেমা পূর্ব্ববৎ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। সারাদিন উপবাস ব্রত পালন করিয়া সন্ধ্যাকালে আহার করিতে যাইবেন, এমন সময় উপবাসী একজন ভিখারী আসিয়া বলিল,—"আমি সমস্ত দিন কিছুই আহার করিতে পাই নাই, আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে।" অতিথি-প্রেমিক ধর্ম্মাত্মা আলী ও ফাতেমা আপন আহার্য্য অতিথিকে প্রদান করিলেন। এতদ্দৃষ্টে সদ্যোব্যাধিমুক্ত হাসান হুসাইনও নিজ নিজ খাদ্য-সামগ্রী অতিথিকে দিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা তিন দিবসই জল পান করিয়া রহিলেন। ধন্য অতিথি-সৎকার! যতদিন পৃথিবীতে অতিথি-সেবার গৌরব থাকিবে, ততদিন তাঁহাদের কীর্ত্তিগাথা স্বর্ণাক্ষরে মানব অন্তরে চিত্রিত থাকিবে। দেবী ফাতেমা স্বামীর আদিষ্ট বা ঈশ্বরের নিয়োজিত কোন কার্য্যে শিথিলতা প্রকাশ করিতেন না। স্বামী যাহা বলিতেন, তিনি বিনাবাক্যব্যয়ে তাহা প্রতিপালন করিতেন।

তিনি তাঁহার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলেন, মর্ত্ত্যবাসীদিগের মধ্যে দয়াময় খোদা দুই ব্যক্তিকে সর্ব্বাধিক সম্মানিত ও

গৌরবান্বিত করিয়াছেন,—তন্মধ্যে একজন তদীয় পিতা, দ্বিতীয় জন তাঁহার স্বামী বীরকেশরী আলী।

তিনি একমাত্র স্বামীকেই জানিতেন। তাঁহার স্বামী দরিদ্র হইলেও ফাতেমা কখনও তাঁহাকে দরিদ্রতাজনিত দুঃখ কষ্ট উল্লেখ করিয়া বিরক্ত করেন নাই। তিনি দৈন্যাবস্থাতেই নিজকে সুখী মনে করিতেন। তিনি কখনও স্বামীর সঙ্গে অভিমান করেন নাই।

আজন্ম পর দুঃখকাতরা হজরত-কন্যা দেবী ফাতেমার সমাধি বাকী প্রান্তরে অবস্থিত।